বিশেষ সংখ্যা

ঈদুল ফিতর, স্বাধীনতা দিবস ও পুণ্যসপ্তাহ সংখ্যা

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১০ ❖ ২২ - ২৮ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

ঈদ মোবারক

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও
বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা

আমাজনের তীরে নটর ডেমের পদচিহ্ন:
COP-এ এক সবুজ অঙ্গীকারের গল্প

কষ্টভোগী সেবক যিশুর সাথে একাত্ম হওয়া

মন পরিবর্তন ও বিশ্বাস

যাজক দিবসে কথা

সিরেনবাসী শিমোনের স্থলে আমি হলে!

স্বর্গরাজ্যে বাবার ত্রয়োদশ জন্মবার্ষিকী

প্রয়াত বার্ণার্ড অমল রোজারিও
জন্ম: ২৩-০৯-১৯৪৮
মৃত্যু: ২২-০৩-২০১৩

প্রিয় দাদু,

আজ আরও একটি বছর পূর্ণ হলো তোমাকে ছাড়া। যদিও তোমার সাথে সখ্যতা গড়ার জন্য সময় সুযোগ হয়নি, তারপরও যতটুকু সময় তোমাকে পেয়েছি সেই সময়গুলো ছিল অনেক সুন্দর যা আমার এখনও মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই কথা, ঢাকা থেকে বাড়িতে গিয়ে যখন দেখতাম তুমি ক্ষেতে কাজ করতে গিয়েছ, আমিও তখন একটি ভাঙ্গা কোঁদাল নিয়ে তোমার পিছন পিছন ঘুড়ে বেড়াতাম। মনে পড়ে তোমার শাসনের কথা- যখন আমি কোন ভুল কাজ করতাম তখন তুমি শাসন করতে এবং সেই ভুল সংশোধনে সাহায্যও করতে এবং সৎ পথে চলার অনুপ্রেরণা যোগাতে। আমি দেখেছিলাম তুমি একজন আর্দশ সৎ মানুষ ছিলে। তোমার এই গুণের জন্য তুমি এত সুন্দর একটি পরিবার গড়তে পেরেছো। যার ফলে আমরাও সেই শিক্ষায় ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছি। তোমার আদর, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, শিক্ষা আমাদের জীবনের অনুপ্রেরণা ও পাথেয় হয়ে আছে। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর, যেন তোমার রেখে যাওয়া আদর্শকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারি। পিতা ঈশ্বরের নিকট তোমার আত্মার স্বর্গসুখ ও চিরশান্তি কামনা করি ।

তোমার প্রিয়জন

স্ত্রী অর্চনা রোজারিও এবং ছেলেমেয়েরা
কল্যাণী, সি: হিমানী RNDM, লাবণী, হৃদয়, মাধুরী, সি: পূর্ণিতা RNDM
(তিন মেয়ে-জামাই, পুত্রবধু ও সাত নাতি- দুই নাতনী)

বিজ্ঞ/৫৪/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষণীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
Youtube:@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১০
২২ মার্চ - ২৮ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
৮ চৈত্র - ১৪ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ঈদুল ফিতর, স্বাধীনতা দিবস ও পুণ্যসপ্তাহ

ধর্মীয় ও জাতীয় তিনটি ঘটনাকে স্মরণ ও পালন করতে যাচ্ছি আমরা। ২০/২১ মার্চ পবিত্র ঈদুল ফিতর বা ঈদ, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস এবং ২৯ মার্চ পুণ্যসপ্তাহে প্রবেশ করবে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা। ঈদের শাব্দিক অর্থ আনন্দ বা খুশি, পুণ্যসপ্তাহে খ্রিস্টানগণ যিশুর যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কথা স্মরণের সাথে সাথে মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা স্মরণ করে। আর আমরা সকলে স্বাধীনতার স্বাদ বা আনন্দ পেতে চাই। আর তাইতো পরাধীনতার গ্লানি থেকে বেরিয়ে আসতে বাঙালি জাতি একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করেছে; যে সংগ্রাম ছিল মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাতেই ছিল বিজয়ের অনুপ্রেরণা। তাই জাতি গভীর শ্রদ্ধায় ও সম্মানে এ দিনে স্মরণ করে জীবিত ও মৃত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের কোন বিকল্প হতে পারে না যদিও কেউ কেউ অন্য কোন দিবসকে মহিমান্বিত করতে চায়।

ধর্মপ্রাণ বাংলাদেশিদের জীবনে 'ঈদ' উৎসব একটি বিশেষ আবেগের নাম। ধর্মীয় ভাবধারায় তা মুসলমান ভাইবোনদের নিজস্ব হলেও এর আনন্দ সর্বজনীন। আরবি শব্দ 'ঈদের' বাংলা অর্থ খুশি, আনন্দ, আনন্দোৎসব ইত্যাদি। আর ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা, খাওয়া ইত্যাদি। তাহলে ঈদুল ফিতর অর্থ দাঁড়ায় রোজা শেষ হওয়ার আনন্দ। সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে পবিত্র ঈদুল ফিতর আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে। অন্যান্য উৎসব থেকে ঈদের পার্থক্য হলো- সবাই এর অংশীদার। সবার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। ঈদের দিন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এককাতারে শামিল হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি কামনা করে। ঈদের আগের এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা হয়। অপরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে সচেষ্ট হয়। রোজার প্রধান লক্ষ্য ত্যাগ ও সংযম। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে তা হবে সবার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বাস্তবতায় দেখি, রোজার মাসেই ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারসাজি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটানো, পরিবহন ও যানবাহনে নৈরাজ্য, সঠিক সময়ে মজুরি না দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের অসঙ্গতি। ফলশ্রুতিতে বেশ বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তবে আশার কথা এ বছর বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও যাতায়াতে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা গেছে।

ঈদ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তের মুসলিমগণ পারস্পরিক সহযোগিতায় একপ্রাণ হবেন এটিই প্রত্যাশা করা হয়। ঈদ মনকে দেয় আনন্দ। বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় ভালোবাসা-প্রীতি। আত্মীয়দের প্রতি তৈরি করে সহানুভূতি। সর্বোপরি মানুষের অন্তরে দয়া-মমতার বার্তা নিয়ে আসে দিনটি। একে অপরের সঙ্গে হাত কিংবা বুক মেলায়। এক কাতারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়। সামাজিক এই বন্ধন সুদৃঢ় করাই ঈদের মূলবার্তা।

খ্রিস্টানগণ তাদের উপাসনা-বর্ষে তপস্যাকালীন যাত্রার শেষের দিকে শুরু করে পুণ্য সপ্তাহ, যা এ বছর শুরু হবে ২৯ মার্চ তালপত্র রবিবারের মধ্য দিয়ে। পুণ্যসপ্তাহে (পুণ্য বৃহস্পতিবার, পুণ্যশুক্রবার ও পুণ্য শনিবার) খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যিশুর জীবন নিয়ে গভীর ভাবে ধ্যান করেন। ঈশ্বর কীভাবে তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এ জগতে পাঠিয়ে মানবজাতির মুক্তি সাধন করেছেন সেই পরিত্রাণ রহস্য বুঝতে, বিশেষ করে যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থান উপলব্ধি করতে এই পুণ্য সপ্তাহে বিশেষভাবে চেষ্টা করে। একই সাথে নিজেদের জীবনের মুক্তিলাভের বিষয়ে সচেতনা লাভ করে। নিজেরা মুক্তিলাভের প্রত্যাশায় যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করার সংকল্প গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা যিশুর জীবনের কষ্টের সাথে মিলিয়ে তা গ্রহণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আর এ চেষ্টার অন্যতম প্রকাশ হলো খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও যথার্থভাবে খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ, ক্ষমার আদান-প্রদান এবং নীরবতায় ঈশ্বর ও মানুষের উপস্থিতি অনুধাবন।

এবারের ঈদ, স্বাধীনতা দিবস ও পুণ্যসপ্তাহে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা সব ধর্ম,বর্ণ, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল-মতের মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের অটুট বন্ধন। সহনশীলতা, সহাবস্থান ও পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা হোক সমাজের সর্বত্র। ঈদের আনন্দে ধুয়ে মুছে যাক সব দুঃখ-গ্লানি। ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবখানে। ঈদ মোবারক। †

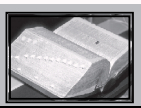

আমিই পুনরুত্থান ও জীবন : আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে কখনো মরবে না। - *(যোহন ১১:২৬)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

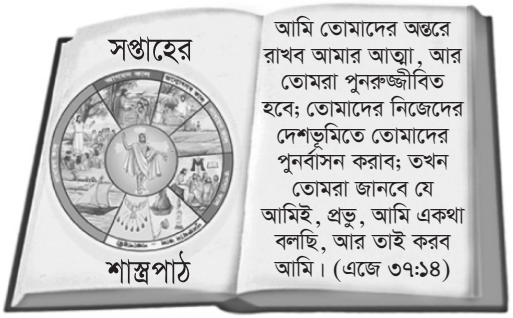

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ মার্চ - ২৮ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

২২ মার্চ, রবিবার
তপস্যাকালের ৫ম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
এজে ৩৭: ১২-১৪, সাম ১৩০: ১-৮, রোম ৮: ৮-১১, যোহন ১১: ১-৪৫ (সংক্ষিপ্ত ১১: ৩-৭, ১৭, ২০-২৭, ৩৩-৪৫)
২৩ মার্চ, সোমবার
তপস্যাকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
দানি ১৩: ১-৯, ১৫-১৭, ১৯-৩০, ৩৩-৬২ (সংক্ষিপ্ত ১৩: ৪২-৬২), সাম ২৩: ১-৬, যোহন ৮: ১-১১ অথবা ৮: ১২-২০
২৪ মার্চ, মঙ্গলবার
তপস্যাকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
গণ ২১: ৪-৯, সাম ১০২: ১-২, ১৫-২০, যোহন ৮: ২১-৩০
২৫ মার্চ, বুধবার
প্রভুর আগমন সংবাদ (দূত সংবাদ), মহাপর্ব
ইসা ৭: ১০-১৪ -- ৮:১০, সাম ৪০: ৬-৮, হিব্রু ১০: ৪-১০, লুক ১: ২৬-৩৮
২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার
তপস্যাকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
আদি ১৭: ৩-৯, সাম ১০৫: ৪-৯, যোহন ৮: ৫১-৫৯
মহান স্বাধীনতা দিবস
২ বিব ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩ (বা এফে ২: ৪-১০), সাম ১৩৭: ১-৬, যোহন ৩: ১৪-২১
২৭ মার্চ, শুক্রবার
তপস্যাকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
জেরে ২০: ১০-১৩, সাম ১৮: ১-৬, যোহন ১০: ৩১-৪২
২৮ মার্চ, শনিবার
তপস্যাকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
এজে ৩৭: ২১-২৮, সাম জেরে ৩১: ১০-১৩, যোহন ১১: ৪৫-৫৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ মার্চ, রবিবার
+ ২০০৩ সি. মেরী পাত্রিসিয়া, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৪ সি. মেরী পেট্রা, এসএমআরএ (ঢাকা)
২৩ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৯০ ফা. ফ্রান্সিস রোজারিও (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ সি. অক্সিলিয়া পাহান, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. বানার্ড পালমা (ঢাকা)
২৪ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৯ ফা. হেনরী ভেন হুফ, ওএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ ফা. ফেডারিক বার্গম্যান, সিএসসি (ঢাকা)
২৫ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৯৭ সি. এম. বোনাভিতা ক্যানন, সিএসসি
+ ২০০৪ ফা. মার্কুশ মারান্ডী (রাজশাহী)
২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৫ ফা. লুইজি অজ্জোনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৬ ফা. আমেদেও পেলিজ্জেজ্জা, এসএক্স
+ ২০২৩ সি. ব্রিজেট গমেজ, সিআইসি (দিনাজপুর)
২৭ মার্চ, শুক্রবার
+ ২০১৪ সি. সূচনা চিরান, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ ফা. আলবিনুস টপ্য (দিনাজপুর)
+ ২০২২ সি. এম. নিবেদিতা, এমসি
২৮ মার্চ, শনিবার
+ ২০০৫ সি. এম. মিডা মূলভে, আরএনডিএম (ঢাকা)

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

ধারা- ২

দ্বিতীয় আজ্ঞা

"তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না।"

"তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, তুমি মিথ্যা শপথ করবে না; ...কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কোন শপথও করো না।"

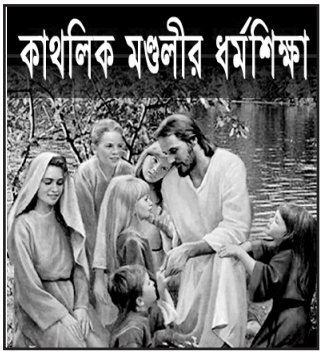

॥ ক ॥ প্রভুর নাম পবিত্র

২১৪২ দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রভুর নামকে শ্রদ্ধা করার নির্দেশ দেয়। প্রথম আজ্ঞারই মত এটা ধর্মীয় পুণ্য গুণের অন্তর্ভুক্ত এবং আরো বিশেষভাবে এটা পবিত্র বিষয়ে আমাদের কথাবার্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২১৪৩ ঐশপ্রকাশের সকল বাক্যের মধ্যে একটি হচ্ছে অনন্য: তা হলো ঈশ্বরের প্রকাশিত নাম। ঈশ্বর তাঁর নাম তাদের কাছেই প্রকাশ করেন যারা তাকে বিশ্বাস করে, তিনি নিজেকে তাদের কাছে ব্যক্তিগত রহস্যে প্রকাশ করেছেন। কোন নামের দান বিশ্বাস এবং অন্তরঙ্গতার পর্যায়ে পড়ে। "প্রভুর নাম পবিত্র।" এই জন্যে সেই নাম অযথা ব্যবহার করা মানুষের উচিত নয়। তার উচিত নীরবে মনের গভীরে এবং প্রেমপূর্ণ আরাধনায় তা ধারণ করা। ঈশ্বরের প্রশংসা, মহিমা ও গৌরব করা ছাড়া মানুষের বক্তব্যে এটা ব্যবহার করা তার পক্ষে ঠিক নয়।

২১৪৪ তাঁর নামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হচ্ছে ঈশ্বরের নিজস্ব রহস্যেরই প্রতি এবং সমস্ত পবিত্র বাস্তবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন যা কিছু এই বাস্তবতা ইঙ্গিত করে। ধর্মীয় অনুভূতি ধর্মের পুণ্যগুণেরই অংশ।

এসব ভয় ও সম্ভ্রম মিশ্রিত অনুভূতি কি খ্রীষ্টীয় অনুভূতি? তাই আমি যা বলছি, তা নিয়ে মনে হয় কেউই তর্ক করবে না। এগুলো সেই ধরনের অনুভূতি যা আমাদের থাকা আবশ্যক; এমন কি গভীরভাবেই তা থাকা আবশ্যক যদি আমরা আক্ষরিকভাবেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দর্শন পাই। সুতরাং আমরা যদি তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করি তবে আমাদের মধ্যে এই ধরনের অনুভূতি থাকবে। তিনি যে উপস্থিত আছেন তা যে পরিমাণে আমরা বিশ্বাস করি, সেই পরিমাণে ঐ অনুভূতিগুলো আমাদের মধ্যে থাকবে। আর সেই অনুভূতি যদি আমাদের মধ্যে না থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, আমরা তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি করিনি এবং বিশ্বাসও করিনি।

২১৪৫ বিশ্বাসীদের উচিত ভয় না ক'রে, বরং বিশ্বাস স্বীকারের মাধ্যমে প্রভুর নামের সাক্ষ্য বহন করা। প্রচার ও ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আরাধনায় ভরপুর হওয়া উচিত।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২২ মার্চ, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলমান ভাই-বোনদেরকে পবিত্র ঈদুল-ফিতর এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। **ঈদ মোবারক**। বিশেষ কারণে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর (২৯ মার্চ - ০৪ এপ্রিল) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। পরবর্তী সংখ্যা (পুনরুত্থান বিশেষ সংখ্যা) যথারীতি প্রকাশ হবে ৫ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা

তালপত্র রবিবার (ক পূজন বর্ষ)

১ম পাঠ: ইসাইয়া: ৫০: -৭
২য় পাঠ: ফিলিপ্পীয়: ২: ৬-১১
মঙ্গলসমাচার: মথি: ২৬: ১৪ --২৭: ৬৬ অথবা ২৭: ১১-৫৪

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আজ আমরা উদযাপন করছি তালপত্র রবিবার। এই দিনটির মধ্য দিয়ে আমরা প্রবেশ করছি পুণ্য সপ্তাহে বা পবিত্র সপ্তাহে। তালপত্র রবিবারের এই পুণ্য উপাসনায় আমরা যিশু খ্রিস্টের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে ধ্যান করে থাকি ও দু'টি ভিন্ন দৃশ্য দেখতে পাই। আর তা হলো: প্রথমত আনন্দের দৃশ্য- মহাগৌরবে যিশুর জেরুসালেম নগরীতে প্রবেশ এবং দ্বিতীয়ত দুঃখভোগের কাহিনী- যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের রহস্য। এই দুটো দৃশ্য আনন্দ থেকে দুঃখ; পরিবর্তনই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের গভীর সত্য প্রকাশ করে। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই জেরুসালেম শহরে যিশুর বিজয়ী বেশে প্রবেশ। যিশু যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার কার্য সমাধা করার লক্ষ্যে মহাগৌরবে নম্র রাজার বেশে গাধার পিঠে চড়ে জেরুসালেমে প্রবেশ করেন।

জেরুসালেমে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে যিশু জেরিখো নগরের অন্ধ বার্তিমেয়কে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। যে চিৎকার করে যিশুকে দাউদ সন্তান বলে আখ্যায়িত করেন। তার এই বিশ্বাসের চিৎকার যারা যিশুর সাথে জেরুসালেমে প্রবেশ করেছিলেন তাদের অন্তরে নিশ্চয় নাড়া দিয়েছিল। অন্ধ বার্তিমেয়ের বিশ্বাসের ঘোষণা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা অন্য সকলের বিশ্বাস ও আনন্দের চিৎকারে পরিণত হয়। উপস্থিত জনতা তালপাতা হাতে নিয়ে আনন্দে চিৎকার করেছিল- "হোসান্না, প্রভুর নামে যিনি আসছেন তিনি ধন্য!" লোকেরা মনে করেছিল যিশু একজন শক্তিশালী রাজা হয়ে তাদের রাজনৈতিক মুক্তি দেবেন। কিন্তু যিশু এসেছিলেন অন্য এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। যিশুর রাজত্ব হলো ভালবাসার রাজত্ব, ক্ষমার রাজত্ব, দয়ার রাজত্ব, সেবার রাজত্ব, আত্মত্যাগের রাজত্ব।

সাধারণ জনতা যারা যিশুর প্রবেশ পথের উপর তাদের চাদর ও সবুজ লতা-পাতা বিছিয়ে দিয়ে এবং খেজুর পাতা হাতে নিয়ে সংবর্ধনা জানাতে এসেছিল তারাও নিশ্চয় তাদের অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তারা যিশুকে রাজার মত বরণ করে নেওয়ার পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারেননি কিন্তু হৃদয়ের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার টানে তাৎক্ষণিক তাদের হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে রাজাকে স্বাগত জানিয়েছেন। যিশু জেরুসালেমে প্রবেশ করছে এবং চারিধারে জনতা উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত করছে "হোসান্না" যার আক্ষরিক অর্থ হলো "রক্ষা কর ও ঈশ্বরের জয় হোক" ভিড় করা লোকদের এমনই বিশ্বাস ছিল যে যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বর পুত্র যিনি এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত তিনিই আমাদের মুক্তিদাতা ও জীবনদাতা। তাই তাদের হৃদয় থেকে এমন আকুতি বের হয়ে এসেছিল। আজকের পাঠে আমরা এক আশ্চর্য বিষয় দেখি। যারা আজ "হোসান্না" বলেছিল, কয়েকদিন পর তারাই আবার চিৎকার করেছিল- "তাকে ক্রুশবিদ্ধ করো!", "ওকে ক্রুশে দাও!"। মানুষের মন কত সহজে বদলে যায়। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে অনুসরণ করি যখন আমরা আমাদের জীবনে ভাল কিছু পাই কিংবা ভাল কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু যখন জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, সমস্যা, চ্যালেঞ্জ, পরীক্ষা, কঠিন পরিস্থিতি আসে তখন আমরা অনেক সময় পিছিয়ে যাই।

তালপত্র রবিবার আমাদের জীবনে এক গভীর সত্যকে প্রকাশ করে- মানুষের মন সময় সময় পরিবর্তনশীল। আমরা অনেক সময় আনন্দের মুহূর্তে ঈশ্বরকে স্বাগত জানাই, কিন্তু দুঃখ-পরীক্ষার সময় তাঁকে ভুলে যাই। তাই আজকের দিনের আহ্বান হলো: আমরা যেন শুধু মুখে নয়, বরং হৃদয় ও জীবনের মাধ্যমে যিশুকে আমাদের জীবনের সত্যিকারের রাজা হিসেবে গ্রহণ করি। একটা গল্প আছে এই রকম: এক গ্রামে একজন মানুষ ছিল যে সব সময় বলত, "আমি যিশুকে খুব ভালবাসি।" একদিন হলো কি! তাদের গ্রামের গির্জায় হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। সবাই আগুন দেখে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একজন বৃদ্ধ বললেন, "যে সত্যিই যিশুকে ভালবাসে, সে আগুনের হাত থেকে গির্জাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে।" তখন দেখা গেল অনেক লোকই দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, কিন্তু খুব কম মানুষই আগুন নিভাতে এগিয়ে আসে। যে মানুষটি বলেছিল, সে যিশুকে ভালবাসে; সে কিন্তু এগিয়ে আসেনি। এই গল্প আমাদের শেখায়- শুধু মুখে নয়, বরং কাজের মাধ্যমে বিশ্বাস দেখাতে হয়।

এই তালপত্র রবিবার খ্রিস্টভক্তদের জন্য কেবল একটি প্রতীকি ধর্মানুষ্ঠান নয়। বরং এটি আমাদের জন্যে বিজয়ের প্রতীক- পাপ, মন্দতা, খারাপ দিক, অহংকার ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বিজয়। যিশু আমাদের শেখান প্রকৃত বিজয় শক্তি, প্রভাব বা ক্ষমতার মাধ্যমে নয়, বরং নম্রতা, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আসে।

আমরা আজকের দিনে আরো ধ্যান করছি যিশুর যাতনাভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুকে নিয়ে। আজকের যাতনাভোগের পাঠে আমরা দেখি যিশু কত অপমান, কষ্ট, নির্যাতন ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছেন। জেরুসালেমে যাওয়ার পূর্বেই যিশু জানতেন যে, জেরুসালেম যাত্রার মানেই মৃত্যুর পথে যাত্রা। কিন্তু তিনি ছিলেন আত্মবিসর্জনের সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি এও জানতেন যে, জনতা যারা আজকে "হোসান্না", "হোসান্না" বলে চিৎকার করছে, হয়ত তারাই আবার উচ্চ কণ্ঠে দাবী করবে- "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে ক্রুশে দাও।" সত্যিই তাই চর্পটি পর্বের প্রথম দিনেই শিষ্যদের সাথে শেষ ভোজের পর রাত্রে গেৎসিমানী বাগানে যাজক ও জাতির প্রবীনদের পাঠানো লোকদের দ্বারা গ্রেপ্তার হন, তাঁকে মহাযাজকের সামনে নেওয়া হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করার মতো কোন অভিযোগ না পেয়ে পিলাতের দরবারে হাজির করা হয়। সেখানেও কোন অভিযোগের প্রমাণ না হওয়াতে ইহুদী ধর্মনেতাদের ঈর্ষার জয় হয়। তাদের প্ররোচনায় জনতা চিৎকার করে পিলাতের কাছে দাবী জানায় "ওকে ক্রুশে দাও"। আমাদের জীবনেও হয়ত কত সময় সেই একই বাক্য উচ্চারণ করেছি, "ওকে ক্রুশে দাও"। যেখানে আমাদের স্বার্থ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেখানেই আমরা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যের অমঙ্গল কামনা করে থাকি। আমরাও অন্যকে বলে থাকি, "ওকে ক্রুশে দাও"। জনতার অনেকেই তো জেরুসালেমের প্রবেশদ্বারে জয়ধ্বনি করছিল, পরে তারাই পিলাতের দরবারে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছিল "ওকে ক্রুশে দাও, ওকে শেষ করে ফেল"। আমরাও সেই জনতার মতো বহুরূপীতে পরিণত হই। বুঝে, না বুঝে আমরাও জনতার পক্ষ নিয়ে সত্য সম্বন্ধে অবগত হয়েও মিথ্যার স্বপক্ষেই গলা ফাটাই।

আজকের এই দিনে মণ্ডলী আমাদেরকে যেমন যিশু খ্রিস্টের জীবনের দু'টি দিক নিয়ে ধ্যান করতে আহ্বান করেন তেমনি আমরাও সেই দু'টি দিকের সাথে আমাদের জীবন সম্পৃক্ত করতে পারি। প্রথমত, আসুন আমরা আমাদের হৃদয় জেরুসালেমে যিশুকে প্রবেশের সুযোগ করে দেই। তাকে আমাদের হৃদয় রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার অর্থ হলো খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবন যাপন করা। দ্বিতীয়ত, আমরা যেন আমাদের যে স্বার্থপরতা, অহংকার, ঘৃণা, মন্দ দিক আছে, পাপগুলোকে যেন দূর করতে পারি। যিশুর দেখানো বিনয়ের পথ, ভালবাসার পথ, ক্ষমার পথে যেন হাঁটতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের সবাইকে অনেক আশীর্বাদ দান করুক ॥

পবিত্র রমজান এবং ঈদুল ফিতর ২০২৬ উপলক্ষে

ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

গভীর আনন্দের সাথে পবিত্র রমজান মাসের রোজা এবং রোজার শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আমি আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করছি। ঈশ্বর, যিনি এক, জীবন্ত, অপরিসীম সত্তা, যিনি দয়ালু ও সর্বশক্তিমান, স্বর্গ ও মর্ত্যের সৃষ্টিকর্তা, যিনি মানবকূলের সাথে কথাও বলেছেন *(২য় ভাটিকান মহাসভা, অন্যান্য ধর্মসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক বিষয়ক ঘোষণাপত্র, ২৮ অক্টোবর, ১৯৬৫, অনুচ্ছেদ-৩)* তাঁর উপর বিশ্বাসী আপনারা এই উৎসব পালন করছেন, যে উৎসবটি আপনাদের সাথে আমার নৈকট্য, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করার সুযোগ এনে দেয়।

দৈবক্রমেই এই বছরের পঞ্জিকা অনুসারে আপনাদের রমজান সময়টিতেই খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসীগণ উপবাসকাল পালন করছেন যা খ্রিস্টমণ্ডলীকে যিশুর পুনরুত্থান উৎসবের দিকে পরিচালিত করে। গভীর আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ এই সময়টিতে আমরা অধিকতর বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে ও তা অনুসরণ করতে সাধনা করি। এই পারস্পরিক যাত্রাকালে আমরা আমাদের সহজাত দুর্বল স্বভাব স্বীকার করতে এবং যেসব পরীক্ষা-প্রলোভন আমাদের হৃদয় মনকে ভারী ক'রে তোলে সেগুলোকে জয় করতে উদ্বুদ্ধ হই।

যখনই আমরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হই, হোক তা ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক, তখন প্রায়ই আমরা বিশ্বাস করি যে, এর কারণসমূহ জানতে পারলেই বুঝি সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুস্পষ্ট পথ উন্মোচিত হবে। বাস্তবে আমরা প্রায়ই উপলব্ধি করি যে, এসকল পরিস্থিতির জটিলতা আমাদের শক্তি সামর্থ্যের নাগালের বাইরে চলে যায়। মাত্রাতিরিক্ত তথ্য, ধারাবাহিক বর্ণনা ও প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির এই যুগে আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টিশক্তি বাধাগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে এবং এতে আমাদের কষ্টভোগ আরও প্রকট হতে পারে। এমনি ধরনের মুহূর্তে সহজেই একটি প্রশ্ন সামনে উঠে আসে, সামনের দিকে অগ্রসরে কিভাবে আমরা একটি পথের সন্ধান পেতে পারি? একেবারে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের পক্ষে বোধগম্য নাও মনে হতে পারে, যা আমাদেরকে একধরণের অসহায়ত্বের দিকে নিয়ে যায়।

এমনতর পরিস্থিতিতেই আসতে পারে হতাশা, নিরাশা, যুদ্ধ, কিংবা সহিংসতা। বিশ্বাস যে ধৈর্যের দাবী করে সেই ধৈর্যকেও পাশ কাটিয়ে এই ভগ্ন পৃথিবীতে হতাশার মুহূর্তে সহিংসতাকেই ন্যায্যতা স্থাপনের একটি সহজ উপায় বলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। তবুও বিশ্বাসীবর্গের জন্য এর কোনটিই গ্রহণযোগ্য পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী মানুষ তাঁর দৃষ্টিকে স্থির নিবদ্ধ করেন অদৃশ্য এক আলোর দিকে, যিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা- সর্বশক্তিমান, পরম দয়াবান, একমাত্র ন্যায়পরায়ণ- "যিনি সততা দিয়ে জাতি সকলকে বিচার করেন ও পরিচালনা দেন" *(সামসঙ্গীত ৯৬: ১০)*। এমন ধরণের বিশ্বাসী ব্যক্তি তার সর্ব শক্তি দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আদেশ অনুসারে জীবন-যাপন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কেননা, একমাত্র তাঁর মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রতিটি মানব হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্খিত উভয় প্রত্যাশা: নতুন একটি জগত এবং শান্তি।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা (খ্রিস্টান ও মুসলমানসহ সকল শুভ চিন্তার মানুষেরা) একত্রে ভাবতে ও নতুন পথ খুলে দিতে আহ্বান পেয়েছি যার মাধ্যমে আমাদের জীবন নবীকৃত হতে পারে। এই নবায়ন সম্ভবপর হতে পারে প্রার্থনার দ্বারা পরিপুষ্ট একটি সৃজনশীলতার মাধ্যমে, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে এমনতরো উপবাসের শৃঙ্খলা দ্বারা এবং বাস্তবধর্মী দয়ার কাজের মাধ্যমে। প্রেরিতদূত সাধু পল আমাদের উৎসাহিত করে বলেন, "মন্দতার দ্বারা পরাজিত হয়ো না, কিন্তু উত্তমতার দ্বারা অন্যায়কে জয় কর" *(রোমীয়- ১২:২১)*।

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আপনাদের মধ্যে যারা ন্যায্যতা, সমতা, মর্যাদা এবং স্বাধীনতা প্রত্যাশা করেন এবং তার জন্যে শারিরীক ও আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রাম করছেন, আপনাদের সাথে আমিও একাত্মতা প্রকাশ করছি, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, কাথলিক মণ্ডলী আপনাদের পাশে থেকে সংহতি প্রকাশ করছে। আমরা শুধুমাত্র কষ্ট-যন্ত্রণার দিক থেকে একাত্ম হয়ে আছি তা নয়, বরং এই ভগ্ন পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ করার পুণ্য দায়িত্বের দিক থেকেও একতায় আছি। সত্যিই আমরা "সকলে একই নৌকায় রয়েছি" *(পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র: ফ্রাত্তেল্লি তুত্তি, ৩ অক্টোবর ২০২০, অনুচ্ছেদ ৩০)*।

আপনাদের সকলের প্রতি, আপনাদের পরিবার, এবং আপনারা যে দেশে বসবাস করেন, সেখানকার সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা বাণী হলো শান্তি। এটা কোন অলীক বা কাল্পনিক চিন্তাপ্রসূত শান্তি নয়, বরং পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও'র কথা অনুসারে "জীবনের হৃদয়-নিঃসৃত" একটি শান্তি *(পোপের বাণী, ৫৯তম বিশ্ব শান্তি দিবস, ১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি:)*। এমনি ধরনের শান্তি সৃষ্টিকর্তা থেকে প্রাপ্ত একটি উপহার এবং সংলাপের মাধ্যমে শত্রুতা কমিয়ে অন্তরে স্থান করে নেয়, ন্যায্যতার চর্চা করে এবং অন্তরে ক্ষমাশীলতা ধারণ করে। এবছর একই সময়ে রমজান এবং খ্রিস্টধর্মের উপবাসের অভিজ্ঞতা আমাদের হৃদয়কে রুপান্তর করে নতুন পৃথিবী গড়ার এমনতরো উদ্দীপনা সৃষ্টি করুক, যেখানে শান্তির সাহসিকতা দেখে যুদ্ধের অস্ত্র পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

এই আবেগপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে আমি প্রার্থনা করছি, যেন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষমাশীল ভালবাসা ও স্বর্গীয় প্রশান্তি দিয়ে আপনাদের প্রত্যেককে পূর্ণতা দান করেন।

ভাতিকান থেকে, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টবর্ষ তারিখে প্রদত্ত।

জর্জ যাকোব কার্ডিনাল কূভাকাদ
(প্রধান কর্মাধক্ষ্য)

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কদিথুওয়াক্কু জানাকারাৎনে কানকানামালাগে
(মহাসচিব)

(ভাষান্তরঃ ফাদার কাকন কোড়াইয়া এবং ফাদার প্যাট্রিক গোমেজ)

পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

পঞ্জিকা অনুসারে এই বছর আপনাদের মাসব্যাপী রোজা রাখার সিয়াম সাধনা এবং আমাদের পবিত্র উপবাসকাল তথা তপস্যাকাল একই সময়ে পালিত হচ্ছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরা মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ক'রে পবিত্র ঈদুল ফিতর তথা ঈদ উদযাপন করেন; আর খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ চল্লিশ দিন তপস্যা তথা উপবাস, প্রার্থনা ও দান করার মধ্য দিয়ে যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান মহোৎসব তথা ইস্টার মহোৎসব উদযাপন করেন। ধর্মীয় তাৎপর্যের দিকে উপবাস বা রোজা ব্যক্তির জীবনে নিয়ন্ত্রণের সাধনা বাড়িয়ে দেয়; আধ্যাত্মিকভাবে ব্যক্তিকে একটি আনন্দঘন মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত করে। এবারে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরা সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর মহোৎসবের জন্য; আর খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ প্রস্তুতি নিচ্ছে যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান মহোৎসব তথা পাস্কা মহোৎসব পালন করার জন্য।

বাস্তবতার নিরিখে আমরা বলতে পারি যে, উভয় মহোৎসব আনন্দের কথা বলে। ইস্টার বা পাস্কা হলো মৃত্যুর উপর যিশুর মহাবিজয়; মৃত্যুকে জয় করে যিশু হয়েছেন পুনরুত্থিত। শুধু নিজে নয়; সাথে গোটা মানব জাতির জন্য এনে দিয়েছেন পরিত্রাণ, মুক্তি, নব জীবন। অতএব ইস্টার বা পাস্কা হলো নবজীবনের মহোৎসব। এই নবজীবনেই আছে পরম আনন্দ যা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত।

বর্তমান পৃথিবী অনেকভাবেই বন্দী দশায়; পৃথিবীকে এই অবস্থা থেকে বের করতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে রূপান্তর, তথা নবজীবন। যুদ্ধবিগ্রহ, অস্ত্র ও তলোয়ারের শাসানি, সকল প্রকার বিরোধ, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেরিয়ে আসা। বর্তমান পৃথিবীতে অনেকদিকেই অনেকভাবে উন্নয়নের জোয়ার এনেছে। এই উন্নয়ন যেন হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক জীবনে ব্যক্তি, সামাজিক এবং আরো ব্যাপক পরিসরে।

আধ্যাত্মিক এই সাধনা চলে রমজান ও খ্রিস্টীয় উপবাস কালে, যখন মুসলিম ও খ্রিস্টান সবাই নিজেদের প্রস্তুত করে নতুন মানুষ হবার জন্যে; বলা যায় 'পুনরুত্থিত' মানুষ হয়ে উঠার জন্য। আর এই মর্মে পবিত্র ঈদ ও ইস্টার মহোৎসব একই বাণীর আমেজ নিয়ে উপস্থিত হয়।

এবারের ঈদ ও ইস্টার আমাদের মধ্যে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির সুবাতাস বয়ে আনে। বর্তমান পৃথিবীতে কিছু কিছু হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতা থাকলেও, আমরা বাংলাদেশী হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে এই ধর্মীয় উৎসবগুলো (ঈদ ও ইস্টার) পালন করতে পারি বৈকি!

আসুন, এমন ভ্রাতৃত্বের আমেজেই আমরা আপন আপন ধর্মীয় আমেজে পালন করি: পবিত্র ঈদুল ফিতর আপনারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী যারা; আর আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তগণ পবিত্র ইস্টার বা পুনরুত্থান মহোৎসব পালন করি।

আপনাদের সবার প্রতি রইল পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ঈদ মোবারক! ঈদ মোবারক !!

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
সভাপতি
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী
খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

যাজক দিবসে কথা

ফাদার লেনার্ড রিবেরু

ছবি: ইন্টারনেট

কাথলিক উপাসনাচক্রে পুণ্য দিবসত্রয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার সান্ধ্যযজ্ঞে এর শুরু হলেও সকালের অভ্যঞ্জন খ্রিস্টযাগ-তেল আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব-গভীরতা ও মাহাত্ম্য যথেষ্ট। কেননা ঐ খ্রিস্টযাগে ৩ রকমের তেল আশীর্বাদ করা হয় যা বছরব্যাপী ব্যবহৃত হয় সংস্কার সম্পাদনে। দিনটি যাজকের জন্যে বিশেষ দিন। কেননা দিনটি অভিষিক্ত যাজকরূপে সকল যাজকের জন্মদিন বার্ষিকী। আনন্দ-কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদের এই যজ্ঞে যাজকগণ ধর্মপালের প্রতি ব্রতগুলো নবায়ন করে নিজেদের আরো যাচিয়ে ও সাজিয়ে নেন। শক্ত বন্ধনে, সেবা ও আনুগত্যের একাত্মতায় ধর্মপাল ও ভক্তবাসীর সাথে। উপাসনার গাম্ভীর্যতার মিলন ঘটে ধর্মপাল, যাজক ও ভক্তের। ত্রিবিধ এই মিলন, ত্রিবিধ এই আশীর্বাদিত তেল নবায়ন আনে সকলের জীবনে নবচেতনার ও আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট হয়ে। সবাই ফিরে স্ব-স্ব ঠিকানায় নিস্তার দিবসত্রয়ের মাহাত্ম্যে সিক্ত হতে সক্রিয় অংশগ্রহণে।

প্রভুর অন্তিমভোজের পুণ্য বৃহস্পতিবার এর ত্রিবিধ ঘটনা-শিষ্যদের পা ধুয়ানো, যাজকীয় ও খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার স্থাপনের মূলে একই অর্থ বা আহ্বান। তা হলো, ঈশ্বরকে ও ভক্তমণ্ডলীকে ভালোবেসে সেবা এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরের তরে বিলিয়ে দেওয়া। যাজকগণ সেবা ও ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সেবাময়ী যাজকত্ব বিলিয়ে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ- প্রতিশ্রুতি পালনে সদা উন্মুখ। তবে তা পূরণ ও পালন কঠিনও বটে।

যাজক যখনই যজ্ঞ নিবেদন, উৎসর্গ করেন তখন তাকেও উৎসর্গকৃত, নিবেদিত হতে হবে। কেননা যিশু এই যজ্ঞে বলিকৃত হন, যাজক যিশুরই স্থানে যজ্ঞ নিবেদনে এই চেতনা যাজকীয় সত্তায় ধারণ করতে হবে। বর্তমান সময়ে অনেক দর্শন যুক্তি, কথা নিয়ে খ্রিস্টযজ্ঞ যে রহস্য তা বললেও এটি বাস্তবতা বহির্ভূত নয়। এটা আরো কঠিন যদি আমরা খ্রিস্টযাগ এর অর্ন্তনিহিত অর্থ বুঝে না থাকি। খুব সংক্ষেপে: Jesus allows us to enter His "Persona" for He empowers us to act "in Persona Christi."

যিশু প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যাজক উৎসর্গ করেন। এই প্রেমযজ্ঞে তিনি পরিবর্তিত হোন, হয়ে ওঠেন ভালোবাসার মানুষ। এই প্রেম ঈশ্বরের নিমিত্তে ভক্তজনগণের তরে। ভক্তজনগণ এই যজ্ঞে অংশগ্রহণ করে আত্মায় গ্রহণ করে যিশুকে। "খ্রিস্টপ্রসাদ" গ্রহণ করে এতে করে ভক্ত ও হয়ে উঠে যিশু। কেননা সে যা পায় ও খায় তা যিশুর দেহ। এতে করে সে যা খায় তা সে হয়ে যায় *As a result he becomes what he eats*। সেই যিশুকে গ্রহণই হয়ে উঠে *Praxis* স্বর্গীয় জীবন। এই আহ্বান সবার জন্য - এর চেয়ে মহান *Praxis* আর কি হতে পারে।

যাজক সম্বন্ধে আমরা যখন চিন্তা ও কল্পনা করি, তখন আমাদের মনে ভেসে ওঠে যাজকের একটি চিত্র "তিনি বই খুলে প্রাহরিক প্রার্থনা করছেন, নীরবে বসে ধ্যান করছেন, মাথায় হাত রেখে কাউকে আশীর্বাদ করছেন, পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করছেন, পাপস্বীকার শুনছেন, রোগীলেপন করছেন, বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন, বিবাহ সংস্কার দিচ্ছেন, পরিবার ভিজিট করছেন, মানুষ তার কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলছে, মৃতকে কবরে শায়িত করছেন ও দয়ার কাজ করছেন।" এই ধরণের চিত্রই মনে ভেসে ওঠে। আসলে এটাইতো কাথলিক যাজকের জীবন।

খ্রিস্টযাগ-রীতিতে ফুটে ওঠে যাজকের পূর্ণ পরিচিতি ও সেবাকাজ। একদিকে যাজকের কাজ পরিত্রাণদায়ী খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করা অন্যদিকে যিশুরই আদর্শে যাজকের জীবনটা একটি 'যজ্ঞ নিবেদন'। খ্রিস্টযাগের প্রার্থনার ৪টি শব্দ বা ৪টি ক্রিয়া বা ৪টি মনোভাবের মধ্যে রয়েছে যাজকীয় জীবন ও সেবাকাজের সার-সংক্ষেপ। প্রতিটি খ্রিস্টযাগের প্রার্থনায় বলা হয়, "তিনি (যিশু) রুটি হাতে নিলেন, এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তা ভাঙ্গলেন, এবং শিষ্যদের দিয়ে বললেন: 'নাও, এ থেকে খাও সকলে– কেননা এ আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে'।" আজকের দ্বিতীয় পাঠে সাধু পৌল সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, "এবার তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন; তারপর তা শিষ্যদের দিতে দিতে বললেন: 'এ আমার দেহ, তোমাদের জন্য যা সমর্পিত হবে। তোমরা আমার স্মরণেই এই অনুষ্ঠান করবে!' তেমনিভাবে ভোজের শেষে তিনি পানপাত্রটিও নিয়ে বললেন: 'এই পাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি, যে-রক্ত তোমাদের জন্যই পাতিত হবে।"

১) ৪টি ক্রিয়া/মনোভাব হলো: হাতে নিলেন, ধন্যবাদ জানালেন, ভাঙ্গলেন, ও দিলেন।

ক) 'হাতে নিলেন': হাতে নেওয়া মানে কী?

- বেছে নেওয়া (যেমন, প্রবক্তা জেরেমিয়, পিতর ও অন্যান্য শিষ্য);
- আপন করে নেওয়া; যিনি মনোনীত করেন তার আপন সম্পদ হয়ে ওঠা।
- একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আলাদা করা। উদ্দেশ্য: সকল জায়গার সকল মানুষের কাছে বাণী প্রচারের জন্য তিনি আলাদা 'তোমরা জগতের কিন্তু জগতের নও' জগতে কিন্তু আলাদা।
- এক হাতে নয়, দু'হাতে নিলেন, দু'হাতে মানে অত্যন্ত সচেতনভাবে, আন্তরিকতার সাথে, অধিকার নিয়ে, আংশিক নয়, পুরোপুরিভাবেই আপন করে নেওয়া।
- কেউ নিজে নিজে যাজক হয় না যিশু বলেন, 'তোমরা আমাকে মনোনীত করো নি, আমি তোমাদের মনোনীত করেছি।'
- যাজকত্ব মানবিক অর্জন নয়, নিজ কৃতিত্ব নয়, যাজকত্ব একান্তই একটি অনুগ্রহ এবং ঐশরিক বিষয়। তাই যাজকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে মণ্ডলীর মাধ্যমে যিশুই তাদের মনোনীত করেছেন অর্থ্যাৎ তিনি দু'হাতে যাজকদের বরণ করেছেন। যাজকত্ব অর্জন নয়, যোগ্যতা নয়, কৃতিত্ব

নয়, যাজকত্ব হলো যাজকদের প্রতি ও ভক্ত-মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ, তাঁর দয়া, এই চেতনা যাজকদের বিনম্র রাখবে, সর্বদা কৃতজ্ঞ রাখবে।

- অভিষেকের গুণে যাজকগণ সর্বদা যাজক। মাত্র একটি জাতি বা গোষ্ঠীর যাজক নয়, মাত্র একটি অঞ্চলের যাজক নয়, যাজকগণ সবার। যাজক হিসাবে তিনিই সর্বজনীন ব্যক্তিত্ব, যাজকদের যিশুই রুটির মতো হাতে নিয়েছেন, দু'হাতেই নিয়েছেন, তিনিই যাজকদের রক্ষা করবেন ও পরিচালনা করবেন।

খ) 'ধন্যবাদ জানালেন': ধন্যবাদ মানে

- আশীর্বাদ করা, যাকে আশীর্বাদ করা হয় তার বিষয়ে মঙ্গল চিন্তা করা হয়, ভাল কথা বলা হয়, পিতা ঈশ্বর যেমন তাঁর পুত্র যিশুর সম্বন্ধে বলেন, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, আমার একান্ত প্রিয়জন'।
- যাজক একজন আশীর্বাদিত ব্যক্তিত্ব। যিশু বলেন, 'তোমরা আমার বন্ধু, আমার পিতার কাছ থেকে যা-কিছু শুনেছি, সবই তোমাদের বলেছি।
- সমালোচনা বাদ দিয়ে, বিরোধিতা না করে, যাজকদের সম্বন্ধে আমাদের ভাল চিন্তা করতে হবে, যাজকদের বিষয়ে আমাদের ভাল কথা বলতে হবে। বিশেষভাবে নতুন প্রজন্ম আমাদের ছেলে-মেয়েদের কাছে। তাতে তারা শুনতে পাবে যাজকীয়/ব্রতীয় জীবনের জন্য ঈশ্বরের আহ্বান।
- নিরব প্রার্থানায় ও ধ্যানে যাজক শুনতে পাবে যিশুর কথা, 'তুমি আমাকে মনোনীত করনি, আমিই তোমাকে মনোনীত করেছি, তুমি আমার বন্ধু, পিতার কাছে যা শুনেছি তা তোমাকে বলেছি।'
- যাজক হিসাবে যাজকগণ অন্যকেও আশীর্বাদ করবে। আশীর্বাদ মানে অন্যদের সম্বন্ধে ভাল কথা বলা, সমালোচনা নয়, নিন্দা নয়।

দৃষ্টান্ত: একবার একজন প্রতিবন্ধি মেয়ে একজন যাজকের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে বলল, "ফাদার, আমাকে আশীর্বাদ করুন।" তখন ফাদার তাড়াহুড়া করে তার মাথায় হাত না রেখে দূর থেকে তার দিকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। মেয়েটা বলে ওঠল, না ফাদার, এই আশীর্বাদে কাজ হবে না। আমি আসল আশীর্বাদ চাই।

তৃনা কাছে এসে ফাদারকে জড়িয়ে ধরে তার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ধরল। ফাদারও তাকে জড়িয়ে ধরলো। 'তৃনা ঈশ্বর তোমাকে অনেক ভালোবাসেন, তুমি তাঁর সন্তান, তাঁর কন্যা। তুমি তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান, অনেক প্রিয়। ঈশ্বর তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন।' এই কথা শোনার পর তৃনা মাথা তুলে নিল। তার মুখে হাসি ফুটলো।

- যাজক এই ভাবে সবাইকে আশীর্বাদ করবেন, তাড়াহুড়া করে নয়, আন্তরিকতার সঙ্গে।
- আশীর্বাদ করা যাজকের সম্মানীয় অধিকার। আশীর্বাদ মানে ভাল কথা বলা, ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা বলা।

গ) ভাঙ্গলেন, টুকরো টুকরো করলেন:

- যাজক প্রতিদিনই রুটি ভাঙ্গেন। তিনি নিজেও টুকরো টুকরো হন। তিনি নানা ভাবে ভেঙ্গে পড়েন, দৈহিক শ্রম, মানসিক চাপ, সুব্যবস্থার অভাব, মানুষের দুর্ব্যবহার, মানুষের দাবী-দাওয়া, সমালোচনা ও নিন্দা।
- যাজক একজন প্রবক্তা কেননা তাকে প্রবক্তার মত বলতে হয় সত্য কথা ও সত্য বিষয়। সমাজের অভাবী-নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কথা বলতে হয়।
- এ ভাবেই যাজক খন্ড খন্ড হন রুটির মতন। এটাই যাজকের ক্রুশ বহন, ক্রুশের ওপর তার আত্মবলিদান।

ঘ) শিষ্যদের দিলেন

- যাজক নিজেকে দান করেন নানা ভাবে: তার সময়, তার শক্তি, তার স্বাস্থ্য, তার প্রতিভা, আরাম-আয়েশ, তিনি নিঃস্ব হন, তিনি বিলিয়ে দেন তার সবকিছু।
- যাজক নিজের জন্য বেঁচে থাকেন না; তার জীবন অপরের জন্য, দেবার মাধ্যমেই যাজক প্রকৃত শক্তি পান, আনন্দ খুঁজে পান, খুঁজে পান তাঁর পূর্ণতা।
- যাজক ভক্তমণ্ডলীর জন্য। সব মানুষের জন্য ঈশ্বরের উপহার, যিশুর আদর্শে যাজকগণ প্রাধান্য দিবে সমাজের প্রান্তিক, বিপন্ন, অভাবী অবহেলিত মানুষকে। প্রভু যিশুর শিক্ষা ও আদর্শে যাজকগণ তাদের কাছে হবে ঈশ্বরের রুটি।
- ঈশ্বর কাউকে কাউকে ডাকেন তাঁর বিশেষ কাজের জন্য এবং তাদের তিনি দিয়ে থাকেন রহস্যময় অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের সামর্থে তারা খ্রিস্টের অতিন্দ্রীয় দেহ অর্থাৎ খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য-সদস্যাদের কাছে যেতে পারে ও তাদেরকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে।

যাজকত্ব একটি ঐশরিক আহ্বন, জীবিকা-নির্বাহের একটি পেশা নয়; যাজকত্ব একটি নতুন আত্মপরিচয়, একটি চাকরি বা কাজ নয়। যাজক মানেই যিশুর মত হয়ে উঠা। যাজকীয় অভিষেকের গুণে যাজকগণ এমন নতুন চিহ্নে চিহ্নিত হন যা কখনও মুছে যাবে না বা হারিয়ে যাবে না। যাজকীয় অভিষেকে তারা নতুন রূপ লাভ করে থাকে; অন্যদের থেকে তারা ভিন্ন বা আলাদা হয়। তুমি সর্বদাই পুরোহিত, অন্তরে একজন পুরোহিত। যাজকত্ব বা পৌরহিত্যকে জামার মত খুলে রাখার বিষয় নয়। তাই যাজকদের দিনে দিনে আরও বেশি যিশুর মত হতে হবে। যিনি ঈশ্বরের ও তাঁর জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে এসেছিলেন। কষ্টস্বীকার ছাড়া পৌরহিত্য শূণ্য; ত্যাগ ছাড়া যাজকত্ব অর্থহীন। একজন যাজক যতই কষ্ট স্বীকারের মাধ্যমে যিশুর সাথে একাত্ম হতে পারে ততই সে পরিষ্কারভাবে একজন যাজক হয়ে উঠে। প্রতিদিন ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশুকে অনুসরণ করা একজন পুরোহিতের জন্য অসংগত কোন বিষয় নয়। বরং ক্রুশ বহন করা পুরোহিতের একটি আবশ্যকীয় বিষয়।

একজন যাজককে হতে হবে খ্রিস্টীয় দরিদ্রতার প্রতীক বা চিহ্ন। জাগতিক বিষয়ে মন বা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা তাদের চিন্তার বিষয় নয়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি ঈশ্বর যাজক আরোন ও তার বংশধরদের বলেন যে, তারা প্রতিশ্রুত দেশে কিছুই পাবে না। ঈশ্বর নিজেই হবেন তাদের পৈত্রিক সম্পদ।

ঈশ্বর যাজকদের তাঁর জনগণকে আশীর্বাদ করার অধিকার ও অনুগ্রহ দিয়েছেন/দিচ্ছেন। তাই সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদন করার সময় তারা মনে রাখবে, এই আশীর্বাদ বা কৃপা যাজক নিজে তৈরী করে না, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে তা যাজককে দিয়েছেন। তাই "বিনা মূল্যে যা পেয়েছ, বিনা মূল্যে তা অন্যকে দিবে"। যাজকগণ একটি সেতু যা সবার ব্যবহারের জন্য- ছোট বা বড় গাড়ীর, ট্রাক বা পথচারী সবাই জন্য।

সাধু বার্ণার্ড আমাদের স্মরণ করিয়ে বলেন: "একজন পুরোহিত যদি বুঝতে পারেন তার ক্ষমতা/শক্তি, তিনি কি করতে পারেন, তাতে হয়তো তিনি মারা যাবেন।" তাই যাজকদের রক্তের বিনিময়ে হলেও সেই অধিকার বা শক্তি রক্ষা করতে হবে। যাজকগণ বয়সে ছোট হতে পারে, কিন্তু সে প্রবীণ কেননা প্রত্যেক যাজককে কথাবার্তায় ও আচরণে সংযত হতে হবে। যাজক নিজেকে নিজে বেছে নেন নি, নিয়েছেন ঈশ্বর অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। যাজক বাকা কলমে সোজা লিখতে পারেন।

একজন যাজক একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব, কোন রাজনীতিবিদ নন, কোন ব্যবসায়ী নন। যাজক মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে, পার্থিব বিষয়ের দিকে নয়। মানুষ যেন যাজকদের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়। কথা দিয়ে যত নয়, জীবন দৃষ্টান্ত দিয়ে তারা মানুষকে চালাতে সচেষ্ট থাকবে। একবার একজন লোক মৃত্যু শয্যায় পুরোহিতকে ডাকতে বলল। এতে তার পরিবারের সবাই অবাক হল কারণ সে অনেক বছর ধরে গির্জায় যায়নি। সে পুরোহিতকে বলল যে, অনেক বছর আগে সে একজন পুরোহিতের অশালীন আচরণে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এখন জীবনের সন্ধিক্ষণে তার মনে পরিবর্তন এসেছে। তাই যাজকদের জীবন দেখে যেন কেউ বিঘ্ন না পায় বা বিভ্রান্ত না হয়॥

পূর্বপ্রকাশ: সংখ্যা ১২, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

কষ্টভোগী সেবক যিশুর সাথে একাত্ম হওয়া

পুণ্য শুক্রবারের অনুধ্যান

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

কি বার্তা দিয়ে যায় গুড ফ্রাইডে?

খ্রিস্টের যাতনা ও মৃত্যু সম্পর্কে আমার চেতনা ও উপলব্ধি কতটুকু? পুণ্য শুক্রবার কেন স্মরণীয়? কালভেরীতে যিশু ক্রুশে বলিকৃত হন। যিশু মরণ-যন্ত্রণার হাতে সমর্পণ করে-মানব জাতির প্রতি ভালোবাসা দেখালেন। যিশু আমাদের দুঃখের বোঝা বহন করেছেন। তবে কেন আমার বলি গুড ফ্রাইডে (Good Friday) – why good. দিনটি ভাল কেন? আজকের শাস্ত্রবাণীতে ক্রুশময় জীবন ও ক্রুশের প্রতি আমাদের দৃষ্টির কথা ব্যক্ত হয়েছে। পুণ্য শুক্রবারে আমরা আমাদের চিন্তা মনোযোগ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব যিশুর কষ্টভোগের, যিশুর বেদনার ও খ্রিস্টের ক্রুশের দিকে। আজকের ঐশবাণীতে বিষাদময় করুণ সুর অনুভব করি। "সেদিন যারা আমাকে মারছিল, পিঠ পেতে দিয়েছি আমি। লাঞ্ছনা আর থুতু দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিইনি" *(ইসাইয়া ৫০:৬)*। "অথচ তিনি আমাদেরই জন্য যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট। তিনি বরং আমাদেরই অন্যায়- অপকর্মের জন্য অপমানের পাত্র/বিদ্ধ; হয়েছেন। আমাদের অপরাধের জন্যই তিনি চুর্ণবিচুর্ণ/দলিত হয়েছেন *(ইসাইয়া ৫৩:৪-৫)*। "সেই খ্রিস্ট তীব্র আর্তনাদ করতে করতে চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রার্থনা ও মিনতি জানিয়েছিলেন তাঁরই কাছে *(হিব্রু ৫:৭)*।"

প্রভুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু স্মরণ দিবস পুণ্য শুক্রবারে ৩টি শাস্ত্রবাণী ও ক্রুশের উপর যিশুর **৭টি বাণী** আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

ক্রুশের উপর যিশুর ৭টি বাণী:

১। "পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করেছে, ওরা তা জানে না *(লুক ২৩:৩৪)*।"

২। "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে *(লুক ২৩:৪৩)*।"

৩। "মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে! শিষ্যটিকে বললেন, ওই দেখ, তোমার মা! *(যোহন ১৯:২৬)*।"

৪। "এলি এলি লেমা সাবাখথানি! অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ? *(মথি ২৭:৪৬)*।"

৫। "আমার পিপাসা পেয়েছে! *(যোহন ১৯:২৮)*।"

৬। "সমস্তই সমাপ্ত হল! *(যোহন ১৯:২৮)*।"

৭। "পিতা, তোমারই হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম! *(লুক ২৩:৪৬)*।"

ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান: "আমার পিপাসা পেয়েছে! (যোহন ১৯:২৮)"

যিশুর কথা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করুক। যিশু কেন তৃষ্ণার্ত? যিশু পিপাসিত মানুষকে ভালোবাসার জন্য। খ্রিস্টের সেবা হচ্ছে অন্তরে বলিকৃত হওয়া এবং অপরকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করা। দীনতম ভাই-বোনদেরকে হৃদয়ে অন্তরে ও মনে বহন করা। খ্রিস্টের এই জীবন বিসর্জনকারী সেবার নীতি বিশ্বাসীভক্ত হিসেবে জীবনে বাস্তবায়ন করা দরকার। সাধ্বী মাদার তেরেজার মিশনারীস অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের প্রতিটি চ্যাপেলে যিশুর বাণী টাঙ্গানো থাকে- "I trust". মাদার তেরেজা দরিদ্র অবহেলিত কুষ্ঠরোগী ও রাস্তাঘাটে মরণাপন্নদের সেবা করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টীয় ভালোবাসা ও সেবার আদর্শ রেখে গেছেন। আমরাও কী গরীব, বিধবা, শিশুদের অসুস্থদের প্রতি দরদবোধ নিয়ে ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দেই? আত্ম পরীক্ষা করি: আমরা কিসের জন্য পিপাসিত? মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার জন্য কী পিপাসিত? পীড়িতদের সেবা করতে আমরা কি অঙ্গীকারাবদ্ধ? ভাই মানুষের সেবার তরে, আমি আপনি কি নিজেকে রিক্ত করে, আত্মত্যাগে জীবন বিসর্জন দেই? যিশু পিপাসিত ন্যায্যতার জন্য। আমি আপনি কী মানব উন্নয়ন, ন্যায্যতার জন্য কাজ করি? মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করি? আমরা কী ন্যায্যতা প্রচারে নিজেদের উৎসর্গ করব? যিশুর মত আমরা কী অন্যায় কাঠামোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারি না!

"এই যে তোমাদের রাজা!" *(যোহন ১৯:১৪)*: বর্তমান জগতের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত

"তখন প্রায় বেলা বারটা। পিলাত ইহুদীদের বললেন: "এই যে তোমাদের রাজা!" তারা চিৎকার করে বলতে লাগল: "ওকে শেষ করে দেন! *(যোহন ১৯:১৪-১৫)*।" "এই যে তোমাদের রাজা!" এই শাস্ত্রবাণী আমাদের জীবনে কতটুকু সম্পৃক্ত? নিজেদের স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে নেতারা যিশুর মৃত্যু দণ্ড বাদী করলো। অন্যায় বিচারে নির্দোষ মানুষ শাস্তি ভোগ করছে। আজকের সমাজেও প্রতিদিন মানুষের স্বার্থের ও লোভের কাছে বিবেক পরাজিত হচ্ছে। "এই যে তোমাদের রাজা!" তারা চিৎকার করে বলতে লাগল: "ওকে শেষ করে দেন!" এই শাস্ত্র বাণী স্মরণ করিয়ে দেয় অসহায় মানুষ, শরণার্থী, উদ্বাস্তু ও ভাসমান নির্যাতিত কষ্টভোগী ভাই-বোনদের কথা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য পৃথিবীকে করেছে চমকিত, বিস্মিত ও পুলকিত। সেই যুগের মানুষ হয়ে আমরা কেন মানব জীবনের চরমতম অবমাননা করছি? সঠিক মূল্যবোধ বাছাই করতে ঠকে যাচ্ছি বা বঞ্চিত হচ্ছি। আমিও কি স্বার্থের জন্য অনেকবার অন্যের ক্ষতি করিনি? "এই যে তোমাদের রাজা!" পিলাতের কথা দরিদ্রদের প্রতি প্রেমপূর্ণ মনোযোগ, দরিদ্র, দুর্দশা-ক্লিষ্ট ও নির্যাতিত জনগণকে অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে অন্তভুক্ত করে। দীন-দরিদ্রদের আর্তনাদ দিন দিন হৃদয়বিদারক হয়ে উঠছে। মানুষ যেন হয়ে যাচ্ছে ভোগ্যপণ্য, যাকে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, প্রয়োজন শেষ হলে ফেলে দেওয়া হয়। "আমরা দূরে ফেলে দেওয়া" এর এক সংস্কৃতি গড়ে তুলছি। আমাদের ছুঁড়ে ফেলার দেয়ার সংস্কৃতির বিরুদেধ প্রতিবাদ/লড়াই করতে হবে। যারা ক্রমাগত বেশি করে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত অপরিহার্য। কেননা তাদের মধ্যেই আমরা কষ্টভোগী খ্রিস্টের পরিচয় পাওয়ার জন্য আহূত। বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা মনে হলে আমি সব সময় দারুণ কষ্ট অনুভব করি। আমরা সবাই যদি অসহায় সেই চিৎকার শুনতে পেতাম: তারা চিৎকার করে বলতে লাগল: "ওকে শেষ করে দেন! *(যোহন ১৯:১৪-১৫)*।" আমি কি অন্যায় ও অধর্মের কাছে হার মানি? ন্যায্যতা আজ পদদলিত। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির ও অন্যায্যতার জয় জয়াকার। তাই দেশে যেন এখন দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের দমন চলছে। প্রতিশোধ নেওয়া যেন আজ মানুষের নিত্য দিনের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যায় অন্যায়ের কাছে অবরুদ্ধ, মানবতা বর্বরতার কাছে অবরুদ্ধ, সততা অসততার কাছে অবরুদ্ধ। ব্যবসা বানিজ্যে সাধারণ ক্রেতারা পাইকারদের কাছে অবরুদ্ধ। পাইকারেরা মজুতদারের কাছে অবরুদ্ধ। কৃষকেরা মহাজনদের কাছে অবরুদ্ধ। খুদে ঋণগ্রহীতারা এনজিওগুলোর কাছে অবরুদ্ধ। সেবাপ্রার্থীরা সেবাদানকারীদের কাছে অবরুদ্ধ।

যোহন রচিত প্রভু যিশুর যাতনাভোগ কাহিনী: যুদাসের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

"নিস্তার ভোজের পরে যিশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কেদ্রোন গিরিখাদের ওপারে একটি বাগান যেটা বিশ্বাস ঘাতক যুদারও পরিচিত ছিল। ... সেখানে তখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুদাসও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন *(যোহন ১৮:২,৫)*।" অনৈতিক কার্যকলাপ আমাদের সমাজ জীবনকে আতঙ্কিত ও বিপর্যস্ত করে চলেছে। আজকাল আমরা মানুষ অধিকাংশ যুদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। যুদাসের জীবন থেকে শিখতে পারি: প্রতারণা মিথ্যা এবং চৌর্যবৃত্তির মত অসৎ কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করব না। মন্দত্বের স্রোতে নিজেকে নিমজ্জিত করব না। নৈতিক জীবনের প্রতি অনুরাগী হবো। কতবার আমরা অন্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি? কতবার আমরা অন্যের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হয়েছি?

ফিরে এসো ক্রুশ তলে: ক্রুশের মাহাত্ম্য ও চেতনা

ঈশ্বর ও মানুষে (Vertical) এবং মানুষ ও মানুষের (Horizontal) ভালোবাসার মিলন হলো (**+**) ক্রুশ। এক সাথে পথ চলি- মিলন সমাজ গড়ে তুলি। মানুষে মানুষে মিলন মানে প্রান্তিক/পিছিয়ে পড়া, বাস্তুচ্যুত ও ক্ষুদ্র-নৃত্বাত্তিক জনগোষ্ঠির সাথে পথ চলা। বিভিন্ন ধরনের অসহায় মানুষের কথা ভেবে আমরা কি দারুণ কষ্ট অনুভব করি? ক্রুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কষ্টভোগী সেবক যিশুর সাথে একাত্ব হতে। আমাদের যাত্রা যিশুর সঙ্গে কালভেরীর দিকে যাত্রা। নিজেকে রিক্ত করে ক্রুশে ঝুলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। যিশু যদি ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করতেন আমরা ভোগ করতে পারতাম না জীবন বৃক্ষের অমৃত ফল। আমাদের যাত্রা হোক কালভেরীর দিকে যিশুর সাথে গুরু শিষ্যের যাত্রা। আমাদের কণ্ঠে সর্বদাই অনুরণিত হোক একই সুর- "ক্রুশ কাধে জীবন পথে আমিও প্রভু যাব সাথে, তোমার বেদনা আমিও নেব ... ক্রুশে আমার জীবন প্রাণ - ক্রুশে আমার পরিত্রাণ।" ❑

পূর্বপ্রকাশ: সংখ্যা ১২, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সিরেনবাসী শিমোনের স্থলে আমি হলে!

পাভেল ফ্রান্সিস রোজারিও

তখন মহাখালী খ্রিস্টান পাড়ার নতুন গির্জা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়ে গেছে। গির্জাটি ছোট হলেও ভিতরে প্রবেশ করলেই মনের অন্তঃস্থলে ভক্তির সঞ্চার ঘটে। খ্রিস্টমণ্ডলীতে ক্রুশের পথের প্রার্থনার জন্য নিয়ম অনুসারে আমাদের সেই গির্জাতেও ১৪টি স্থানের সুন্দর ছবি টাঙ্গানো। দেখতেই ভালো লাগে।

তবে আগে সেইভাবে খেয়াল না করলেও ২০১৭ কিংবা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে আমি গির্জার পিছনের যেই জায়গাটিতে বসতাম, সেখানে থেকে ক্রুশের পথের পঞ্চম স্থানটি (সিরেনবাসী শিমোনের কাঁধে ক্রুশ স্থাপন) আমাকে অনেক ভাবায়। প্রায় প্রতি রবিবারেই আমি সেই ছবিটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতাম এবং কি যেন ভাবতাম। কিছু তো একটা আছেই কিন্তু আমি ধরতে পারছিলাম না। ঠিক এভাবে কতো রবিবার কেটে গিয়েছিল তা সঠিকভাবে মনে না রাখলেও এক সময় আমার মনে হল ক্রুশের পথের পুরো ১৪টি স্থানকে মূলত দুইভাবে ভাগ করা যেতে পারে -

এক, যেখানে যিশুখ্রিস্টের নিজের একান্ত কষ্টভোগ

১. যিশু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

২. যিশু ক্রুশ গ্রহণ করেন।

৩. যিশু প্রথমবার ক্রুশের নিচে পড়ে যান।

৪. যিশু দ্বিতীয়বার পড়ে যান।

৫. যিশু তৃতীয়বার পড়ে যান।

৬. যিশুর বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়।

৭. যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়।

৮. ক্রুশে যিশুর মৃত্যু হয়।

দুই, আশেপাশের মানুষদের সাথে তার কষ্ট, জ্ঞান ও সতর্কবাণী সহভাগিতা।

১. যিশু তাঁর শোকসন্তপ্ত মাতা মারীয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২. সাইরিনীয় শিমোন যিশুকে ক্রুশ বহন করতে সাহায্য করেন।

৩. ভেরোনিকা যিশুর মুখমণ্ডল মুছিয়ে দেন।

৪. যিশু দ্বিতীয়বার পড়ে যান।

৫. যিশু জেরুশালেমের নারীদের সান্ত্বনা দেন।

৬. যিশুর দেহ ক্রুশ থেকে নামানো হয়।

৭. যিশুকে কবরে সমাহিত করা হয়।

যদিও তখন ঠিক এইভাবে না ভাবলেও আমার কাছে ক্রুশের পথের পঞ্চম স্থান 'সিরেনবাসী শিমোনের কাঁধে ক্রুশ স্থাপন' -টি আমাকে বিশেষভাবে ভাবায়। আমি মনে মনে এই বিশেষ স্থানটি নিয়ে ধ্যান করা শুরু করি। বুঝার চেষ্টা করি, এই নির্দিষ্ট স্থানটিতে এমন কি আছে যা অন্যগুলোতে নেই? এমন কি এখানে আছে যা আমি অনুধাবন করতে পারছি না? এভাবেও কতদিন চলে গেছে তা আমি সঠিকভাবে মনে করতে না পারলেও এক সময় আমার মনে হলো - এই পঞ্চম স্থান কিংবা এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কি আমাকে কিংবা আমাদেরকে কিছু বলতে চান? ভেবে দেখার বিষয় হল, এমন খুব ঘটনা আছে যা চারজন মঙ্গলসমাচার লেখকই উল্লেখ করেছেন এবং 'সিরেনবাসী শিমোনের কাঁধে ক্রুশ স্থাপন' তার মধ্যে একটি *(লুক ২৩:২৬; মথি ২৭:৩২; মার্ক ১৫:২১)* - অর্থাৎ এই ঘটনাটি অবশ্যই বিশেষ কিছু।

এক সময় আমি নিজেকে প্রশ্ন করা শুরু করলাম, খ্রিস্ট যিশুকে যেই সময়ে, যে পরিস্থিতিতে ক্রুশে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, সেই সময়ে আমি পাভেল যদি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে কি সাহস করে যিশুর ক্রুশ নিজের কাঁধে তুলে নিতাম? যেখানে খাবারের টেবিলে মাছ, মাংস কিংবা ডিম না থাকলেই মুখ কালো করে ফেলি, সেখানে একটি কাঁচা গাছের অত্যন্ত ভারী একটি ক্রুশ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জেরুসালেমের উঁচুনিচু পাহাড়ি ঢালে হেঁটে যাওয়া বড়ই কঠিন একটি কাজ।

যাই হোক, বেশ অনেকদিন আমি সিরেনবাসী শিমোনের মতো নিজেও সাহস করে ক্রুশ নিজের কাঁধে নেয়া ও যিশুর কষ্ট কিছুটা উপশম করতে সাহায্য করতাম কিনা। যদিও শিমোনকে বেছে নেয়ার পিছনে রোমান ও ইহুদী নেতাদের কু-মতলব ছিল (পাছে তিনি ক্রুশে উঠার আগেই মৃত্যুবরণ করেন), তারপরেও বাস্তবিক অর্থে যদি আমাকে যিশু নিজেও ডেকে নিয়ে তাঁর ক্রুশটি নিতে বলতেন, আমি কি তা করতাম? আমি আবার এটিও ভাবতে শুরু করলাম যে, আমি যদি ঐ সময়ে থাকতাম, তাহলে কি বিনা দোষে যিশুকে ক্রুশে দেয়ার জন্য প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারতাম?

আমার উত্তর সব সময়ই 'হ্যাঁ'!

এভাবে আমার অনেকটা সময় গড়িয়ে গেছে। দেশ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছি জার্মানিতে। আগের মতো আমার ধর্মকর্ম শুধুই নিয়মিত গির্জায় যাওয়া ও প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ভিন্ন ধর্মীদের কাছ থেকে নানা তির্যকপূর্ণ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে পড়াশোনাও শুরু করেছি মন দিয়ে। বাইবেলও পড়া শুরু করেছি আরও মন দিয়ে। এবং এভাবে পড়তে পড়তে আমার চোখে পড়লো 'যিশু খ্রিস্ট তাঁর অনুসারীদের নিজের ক্রুশ তুলে নেওয়ার আহ্বান' পদটি। *মথি* ১৬:২৪ পদে তিনি বলেছেন, "কেউ যদি আমার পশ্চাদগামী হতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুগামী হোক" *(একই কথা মার্ক ৮:৩৪ এবং লূক ৯:২৩ পদেও উল্লেখ আছে)*।

এই পদটি যখন আমার চোখে পরলো, তখন আমি আবার ক্রুশের পথের পঞ্চম পদটির কথা স্মরণ করলাম এবং একটা সময় আমি যে নিজেকে যিশুর ক্রুশটি নিজের কাঁধে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করতাম এবং মনে মনে এটি ভাবতাম যে, আমি যদি পারতাম, তাহলে আমিও সিরেনবাসী শিমোনের মতো যিশুর ক্রুশ বহন করতাম। এই প্রথম আমি আমার নিজের প্রতিজ্ঞা করা কথার মুখোমুখি হলাম। যিশু তো আসলে আমাদের ইতিমধ্যেই নিজের ক্রুশ নিজের কাঁধে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে বলে গেছেন!

একুশ শতকের খ্রিস্ট ভক্তদের জন্য সুখবর হল এই যে, আমাদের কাউকেই যিশু খ্রিস্ট তার মতো কাঁচা গাছের গুড়ি নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে না বলে বরং নিজেদের ক্রুশ মানে 'আত্মত্যাগ, বিনয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার একটি শক্তিশালী রূপক' অর্থেই তা বলেছিলেন। এখানে 'ক্রুশ' বলতে আক্ষরিক কোনো কাঠের বোঝা নয়, বরং খ্রিস্টের আদর্শ পালন করতে গিয়ে যে সামাজিক লাঞ্ছনা, ত্যাগ বা কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তা ধৈর্য ও আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করাকে বোঝানো হয়েছে। এটি নিজের অহংকারকে 'ক্রুশবিদ্ধ' করে প্রতিদিন খ্রিস্টের পথে চলার এক আমৃত্যু অঙ্গীকারকেই নির্দেশ করেছেন।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম আমি কি তা করছি? না, করছি না। তবে আমার আগে হাজার হাজার বছর ধরে নানা খ্রিস্ট ভক্তরা করে এসেছেন, সাধু সাধ্বীরা করেছেন, বাইবেল খুলে আমরা দেখতে পাই যিশুর প্রত্যেকজন শিষ্যরাই করেছেন। তারা নিজেদের নিত্যদিনের আমিত্বকে ত্যাগস্বীকার করে যিশুর কথা মতো নিজেদের ক্রুশকে নিজের কাঁধে নিয়ে যিশুর অনুসরণ করেছেন।

ঈশ্বর মানুষ হয়ে এই ধরাতে নেমে আসার কারণই কি এটা নয় যে আমরাও যেন স্বর্গে যেতে পারি? যিশু কি ঈশ্বর হয়েও মানুষ হয়ে এই ধরাতে নেমে আমাদের জন্য একটি উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন না! আমাদের কি কোনভাবে এই অজুহাত দেয়ার সুযোগ আছে যে, নিষ্ঠুর জগতের সকল বাঁধা পেরিয়ে পবিত্র জীবনযাপন করা খুবই কঠিন! যিশু কি তা নিজে করে যাননি? যিশুর শিষ্যরা কি তা করে যাননি? সাধু পৌল কিংবা সাধু আগস্টিনের মতো একজন পাপী নিজেদের মন পরিবর্তন করে নিজের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যিশুর অনুসরণ করেননি? তারা যদি পারে, আমি যদি এতদিন গর্ভ করে যিশুকে কখনোই ক্রুশে মরতে দিতাম না কিংবা আমিও শিমোনের মতো যিশুর কাছ থেকে ক্রুশটি নিয়ে তার কষ্ট নিবারণ করতাম বলে যে সাহস দেখিয়েছি, তাহলে এখন বুঝেও তা করছি না?

সময়ের সাথে সাথে আমি ক্রুশের পথের পঞ্চম স্থানটি থেকে আরও এগিয়ে গিয়ে ত্রয়োদশ স্থানে যিশুর দেহ ক্রুশ থেকে নামানোর ঘটনাটিও মনে করতে লাগলাম। এখানে আমরা দেখতে পাই যিশুর মৃত্যুর পর যখন সবাই ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিল, তখন আরিমাথিয়া নিবাসী যোসেফ (Joseph of Arimathea) অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই কাজটি করেছিলেন।

রোমান সাম্রাজ্যে এমন কিছু করা অবশ্যই সাহসের কাজ। কিন্তু আমরা যদি জানি, এই যোসেফ আসলে কেমন ছিলেন এবং তার জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন একটি কাজ করা কি আসলেই আজকের দুনিয়ায় সাহসের কাজ কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো, আমাদের বর্তমান যুগে ঠিক কি কি কর উচিৎ।

মঙ্গলসমাচার অনুসারে, যোসেফ ছিলেন ইহুদি মহাসভার (Sanhedrin) একজন প্রভাবশালী ও ধনী সদস্য, কিন্তু তিনি মনে মনে যিশুর অনুসারী ছিলেন। রোমান আইন অনুযায়ী, বিদ্রোহে দণ্ডিত ব্যক্তির দেহ সাধারণত ক্রুশেই ফেলে রাখা হতো, কিন্তু যোসেফ নিজের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সরাসরি রোমান শাসনকর্তা পোন্তিয় পিলাতের কাছে গিয়ে যিশুর মৃতদেহ প্রার্থনা করেন। অনুমতি পাওয়ার পর, তিনি এবং যিশুর আরেকজন গোপন অনুসারী নিকোদীম (Nicodemus) মিলে অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সাথে যিশুর ক্ষতবিক্ষত দেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনেন। তাঁরা দেহটিকে পরিষ্কার করে দামি সুগন্ধি ও সুন্দর কাপড়ে জড়িয়ে যোসেফের নিজের জন্য তৈরি করা একটি নতুন পাথরের কবরে সমাধিস্থ করেন।

যেখানে নিজের অর্থ, সামাজিক মর্যাদা ও ইহুদি মহাসভার একজন প্রভাবশালী ও ধনী সদস্য হিসেবে নিজের সম্মানকে রক্ষা করার জন্য এসব কাজ থেকে দূরে থাকাই মঙ্গল ছিল, সেখানে তার নিজের সম্মান নষ্ট হল কিনা, ইহুদিরা তাকে ইহুদি মহাসভা থেকে বের করে দিবে কিনা ভেবে পিছুপা হননি। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, যোসেফ কিংবা নিকোদীম কি যিশুর সেই বাণীর কথা মনে করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, "সারা জগতকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলে, তাতে তার কীই বা লাভ হতে পারে?" *(মথি ১৬:২৬; মার্ক ৮:৩৬; লূক ৯:২৫)*।

আজকের এই সহভাগিতা আর বড় করবো না। আশা করি, যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে লিখতে বসেছিলাম, তা ইতিমধ্যেই বলে ফেলেছি। তাই বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যিশুর নাম সাহসের সাথে প্রচার করা, তার শিক্ষা নিজে মেনে অন্যদের মাঝে উদাহরণ স্থাপন করাই কিন্তু যিশুর প্রকৃত আদেশ। দু'হাজার বছর আগে গিয়ে যিশুর ক্রুশ নিজের কাঁধে তুলে নেবার স্বপ্ন না দেখে বরং যিশু খ্রিস্ট আমাদেরকে যেই ক্রুশ তুলে নেয়ার আদেশ দিয়ে গেছেন, আমরা যেন তাই করি - প্রায়শ্চিত্তকালে আপনাদের নিকট এই কামনা। ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকুন, আমাদেরকে সৎ সাহস দান করুন, এই প্রার্থনা করি।

(১৩ নং পৃষ্ঠার পর)

শ্রদ্ধার পরিবেশ থাকে, তাহলে সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠা ব্যক্তির মনও সাধারণত ইতিবাচক হয়। বিপরীতভাবে, যদি কেউ নেতিবাচক পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তাহলে তার মনেও হতাশা বা অবিশ্বাস জন্ম নিতে পারে। তাই সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে সত্য, ন্যায় এবং পারস্পরিক বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানবিক মর্যাদা ও ধর্মীয় বিশ্বাসে গড়ে ওঠা পরিবার ও পরিবেশ হয় সুন্দর, সার্থক ও আনন্দময়। "তোমরা সবাই প্রভুর সান্নিধ্যে নিত্য আনন্দেই থাক; আবার বলছি, আনন্দেই থাক" *(ফিলিপ্পীয় ৪:৪)*।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে মন পরিবর্তনের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। অনেক মানুষ জীবনের কোনো কঠিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করে। কেউ হয়তো আগে স্বার্থপর ছিল, কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছে যে অন্যের কল্যাণে কাজ করাই প্রকৃত সুখ দেয়। এই ধরনের পরিবর্তন মানুষের জীবনে নতুন অর্থ ও উদ্দেশ্য এনে দেয়। এই সকল অভিজ্ঞতা সুযোগ হয় আমাদের পরিবার ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থায়। যিশু বলেন; তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল" *(যোহন ১৫:১৬খ)*। আমাদের অভিজ্ঞতার ও বৃদ্ধির জন্যে কাজে এগিয়ে যেতে হয় ও বিশ্বাসে পরিপক্ক হতে হয়।

উপসংহার: পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালাবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন, যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন। *(যোহন ৩:১৬)*। মনপরিবর্তন ও বিশ্বাস মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দুটি শক্তি মানুষের চিন্তা, আচরণ এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গভীর প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তি যদি তার মনকে ইতিবাচক চিন্তা ও জ্ঞানের মাধ্যমে গঠন করে এবং তার বিশ্বাসকে সত্য, যুক্তি ও নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে সে নিজের জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তুলতে পারে। তাই আমাদের উচিত মনকে উন্মুক্ত রাখা, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং এমন বিশ্বাস গড়ে তোলা যা আমাদেরকে সত্য, সুন্দর, মানবতা ও উন্নতির পথে এগিয়ে ফলশালী হতে নিয়ে যায়।

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

সুধী,
আমি সেলিন রোজারিও, আমার স্বামী লিয়ন কোড়াইয়া গত ১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে নোয়াখালিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়, তার বুকের ১১টি পাঁজর এবং হাত ও পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করানো, সেখানে অবস্থা জটিল হওয়ায় এবং আইসিইউ না পাওয়ায় ১২ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ঢাকার গ্রীনরোডে অবস্থিত গ্রীনলাইফ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তাকে আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং কৃত্রিম অক্সিজেনের মাধ্যমে তার শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখা হয়েছে যেখানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় একলক্ষ টাকা তার এই চিকিৎসায় ব্যয় হচ্ছে। আমি একটি প্রতিষ্ঠানে সামান্য বেতনে সেলসম্যানের চাকুরী করি, আমার ৮ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে; আমার এই সামান্য বেতনের টাকায় আমার স্বামীর চিকিৎসা কোনোভাবেই চালানো সম্ভব নয়।
এতমাবস্থায় আপনার/আপনাদের কাছে আমার স্বামীর চিকিৎসায় আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিনীতভাবে আবেদন জানাই; আপনাদের সহযোগিতার হাত আমার স্বামীকে আবার জীবন ফিরিয়ে দিবে বলে বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

সেলিন পিউরিফিকেশন
সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি কর্পোরেট শাখা
একাউন্ট নম্বর: ৪৪১৫০০২০৯৫১৮১
মোবাইল ও বিকাশ নম্বর : ০১৭১০৮৮৭৭২০

মন পরিবর্তন ও বিশ্বাস

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

ভূমিকা: মনপরিবর্তন (Repentance/ Conversion) ও বিশ্বাস (Faith) হলো পরিত্রাণের মূল ভিত্তি। মন ফিরানো ও যিশু খ্রিস্টের ওপর নির্ভরযোগ্যতা প্রকাশ পায়। "সময় হয়ে এসেছে : ঐশরাজ্য এখন খুব কাছেই। তোমরা মন ফেরাও; তোমরা মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস কর: *(মার্ক ১:১৫)*। মানুষের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী দু'টি উপাদান হলো মন এবং বিশ্বাস। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, সিদ্ধান্ত ও আচরণের পেছনে এই দুই শক্তির গভীর প্রভাব রয়েছে। মন মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু, আর বিশ্বাস হলো সেই শক্তি যা মানুষকে কোন ধারণা, চিন্তা-চিন্তন, মূল্যবোধ বা লক্ষ্যকে সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে গ্রহণ করতে সাহায্য করে ও নতুনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা যোগায়। মানুষের জীবনে যখন মন পরিবর্তিত হয়, তখন তার বিশ্বাসের পরিবর্তন আসতে পারে; আবার অনেক সময় বিশ্বাসের শক্তিই মানুষের মনকে নতুনভাবে গঠন করে। বিশ্বাসের জীবনে মন পরিবর্তন ও পাপ মোচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "সুতরাং তোমরা এখন মন ফেরাও! আর নয়, ফিরেই এসো, তোমাদের সমস্ত পাপ মুছে যাক" *(শিষ্যচরিত ৩:১৯)*। নিজ জীবনের দুর্বলতার সীমাবদ্ধতাগুলো অনুধাবন করে, অনুতাপ করে মনের পরিবর্তন ও পাপমোচন। তাই মনপরিবর্তন ও বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, ধর্মবিশ্বাস ও জীবনের গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মনপরিবর্তন ও বিশ্বাস: "না, আমি তোমাদের বলছি, তা নয়! তবে তোমরা যদি মন না ফেরাও, তাহলে তোমাদের সকলকে কিন্তু ওই ওদেরই মতো প্রাণ হারাতে হবে" *(লুক ১৩:৩)*। মনপরিবর্তন মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ জন্মগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট চিন্তাধারা নিয়ে জন্মায় না; বরং তার পরিবার, সমাজ, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা তার মনকে গঠন করে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ নতুন জ্ঞান অর্জন করে, নতুন মানুষ ও পরিস্থিতির সাথে পরিচিত হয় এবং এসব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তা ও মনোভাব পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তি ছোটবেলায় কোনো বিষয়ে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতে পারে, কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। এই পরিবর্তন অনেক সময় মানুষকে আরও পরিণত, সহনশীল ও বিচক্ষণ করে তোলে। বিশ্বাসের জীবনকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করতে মনের পরিবর্তন ও নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও ধর্মীয় অনুশাসনে জীবনকে পরিচালিত করা। বিশ্বাস মানুষের জীবনে এক ধরনের মানসিক শক্তি প্রদান করে। বিশ্বাস মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং কঠিন পরিস্থিতিতেও তাকে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করে। একজন মানুষ যদি নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখে, তাহলে সে অনেক কঠিন কাজও সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে। বিশ্বাসের জীবন হলো ঈশ্বরের প্রতি অটল আস্থা ও ভরসা রেখে পরিত্রাণ লাভের পথ। "প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠ, তবেই তুমি ও তোমার পরিবারের সকলেই পরিত্রাণ পাবে" *(শিষ্যচরিত ১৬:৩১)*। ঈশ্বরের আদেশ পালন করে আত্মার পরিত্রাণের লক্ষ্যে ঈশ্বর উপর নির্ভরতায় জীবন যাপন। একইভাবে অন্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ায়। পরিবার, বন্ধুত্ব এবং সমাজের স্থিতিশীলতা অনেকাংশে মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।

বিশ্বাসের জীবন আশা ও প্রেরণার উৎস: "আমরা যা কিছু পাবার আশা রাখি, ঈশ্বর বিশ্বাস হল সেই সবকিছুর এক ধরনের অগ্রিম প্রাপ্তি; বাস্তবে যা-কিছু আমরা চেখে দেখতে পাই না, ঈশ্বর-বিশ্বাস হল তার সমন্ধে এক ধরনের প্রামানিক জ্ঞান" *(হিব্রু ১১:১)*। বিশ্বাস মানুষের জীবনে আশা ও প্রেরণার উৎস হিসেবেও কাজ করে। অনেক সময় মানুষ নানা বাধা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। এমন পরিস্থিতিতে যদি তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে সে একদিন সফল হবে, তাহলে সে সহজে হাল ছাড়ে না। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন যিশুতে নিহিত। "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলে জীবিতই থাকবে" *(যোহন ১১:২৫ক)*। যিশুতে বিশ্বাস করা মানে আনন্দ জীবন লাভ করা। ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক মহান ব্যক্তি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল মনোবলের কারণে অসাধ্যকে সাধন করতে পেরেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিলে বলেই আব্রাহাম-সারা আশা নিয়ে আপন দেশ ও আপনজন ত্যাগ করেছেন ও অসাধ্য সাধন করেছেন *(দ্রঃ হিব্রু ১১:৮-১১)*। বিশ্বাসীদের জীবন কখনো কখনো সন্দেহ বা ভয়ের মধ্যে পড়লেও বিশ্বাসের শক্তি তাদের আবার সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

মনপরিবর্তন ও বিশ্বাসের জীবন: সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর উত্তম সৃষ্টির যত্ন নেয় তাদের জন্য অপেক্ষা করেন। "আমার লোকেরা যদি নম্র হয়ে প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং পাপের পথ থেকে ফিরে আসে, তবে আমি স্বর্গ থেকে তাদের শুনব ও তাদের দেশ আরোগ্য/নিরাময় করব" *(২য় বংশাবলী ৭:১৪)*। পরিবর্তন সবসময় সহজ নয়। অনেক সময় মানুষ নিজের পুরোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে এতটাই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে যে নতুন সত্য বা যুক্তিকে গ্রহণ করতে চায় না। বাইবেলে বর্ণিত ছোট ছেলেটি দূরে গিয়ে বুঝতে পেরেছে। বড় ছেলেটি পিতার ভালোবাসায় থেকেও বুঝতে পারে নাই *(দ্রঃ লুক ১৫:১১-৩২)*। এরকম অবস্থায় ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের সম্পর্ক নষ্ট হয় ভালোবাসা ব্যাহত হতে পারে। জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তি সবসময় নিজের চিন্তাকে যাচাই করার চেষ্টা করে এবং প্রয়োজনে ভুল বুঝতে পারলে তা সংশোধন করতে দ্বিধা করে না। এই ধরনের মানসিক নমনীয়তা মানুষকে আরও প্রগতিশীল ও মানবিক করে তোলে, করে তোলে বিশ্বাসী ও ঈশ্বর নির্ভর ব্যক্তি।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধ বিশ্বাস অনেক সময় মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। যদি কোনো বিশ্বাস যুক্তি, জ্ঞান ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই একজন সচেতন মানুষের উচিত তার বিশ্বাসকে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে গড়ে তোলা। এতে বিশ্বাস শক্তিশালী ও অর্থবহ হয়। সুতরাং দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতায় জীবন যাপন করা দরকার।

শিক্ষা: মনপরিবর্তনের পেছনে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে শেখায় এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিস্তৃত করে। পুঁথিগত শিক্ষা, ধর্মীয় আইন-কানুন ও আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি ও কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় অনুশাসন আমাদের মননকে প্রসারিত করে ও জ্ঞানী করে তোলে। এই শিক্ষা ও জ্ঞানই ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাবান মানুষ হয়ে ঈশ্বর-ভিরুতা ও বিশ্বাসে জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণত বিভিন্ন মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। শিক্ষা মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এবং তাকে যুক্তিবাদী ও মানবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে জীবন যাপন করে। ফলে তার মন ইতিবাচকভাবে পরিবর্তিত হয় এবং ব্যক্তির বিশ্বাস বৃদ্ধি ও ফলশালী হয়।

পারিপার্শ্বিকতা: পরিবেশ ও সমাজ ব্যক্তির মন ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। পরিবারে যদি ইতিবাচক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক

(বাকি অংশ ১২ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনা

অর্ঘ্য পিটার রোজারিও

স্বাধীনতা মানুষের জীবনের একটি অমূল্য অধিকার। স্বাধীনতা বলতে আমরা মূলত বুঝতে পারি নিজের ইচ্ছা, চিন্তা, মতামত ও কাজকে অন্যায় বাধা বা শোষণ ছাড়া প্রকাশ ও পরিচালনা করার অধিকার। অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ নিজের মর্যাদা, অধিকার ও স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে। স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিগত জীবনের বিষয় নয়; এটি একটি জাতির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাধীন জাতি নিজের আইন, শাসনব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। যখন কোনো দেশ অন্য দেশের অধীন থাকে, তখন সেই দেশের মানুষের এসব অধিকার প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। তাই স্বাধীনতা একটি জাতির আত্মমর্যাদা ও উন্নতির প্রধান ভিত্তি।

মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার। তবে স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে কেউ ইচ্ছামতো অন্যের ক্ষতি করবে। প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা অন্যের অধিকারকে সম্মান করে এবং সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। তাই আমাদের স্বাধীন হলেই হবে না, আমাদের স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমান জ্ঞান থাকতে হবে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। অসংখ্য শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশে বাস করছি। তাই স্বাধীনতার মূল্য উপলব্ধি করা এবং দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব। বলা যায়, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং একটি জাতির গৌরব। এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা, এর মর্যাদা বজায় রাখা এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে আমরা তা পালনে ব্যর্থ হই। যার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পরেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যর্থতার স্বীকার হই।

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার চেতনা সর্বাধিক দৃঢ়ভাবে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায়। তখন বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি শাসনের দীর্ঘ অত্যাচার, বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক উপেক্ষার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং নিজের জাতীয় মর্যাদা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মহান সংগ্রামে অংশ নেয়। ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকায় বাঙালি নেতাদের গ্রেফতার এবং সেনা হস্তক্ষেপ শুরু করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ গোপনে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই দিনকে আমরা জাতীয় ইতিহাসে মুক্তির প্রাথমিক ঘোষণা হিসেবে স্মরণ করি। ২৬ মার্চ মূলত একটি রাজনৈতিক ও মানসিক স্বাধীনতার সংকেত, যা বাঙালি জাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সূচিত করে।

অন্যদিকে, ৫ আগস্টের স্বাধীনতা বা যা জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস হিসেবে পরিচিত। ৫ আগস্ট ২০২৪-এর "স্বাধীনতা" বলতে বাংলাদেশের সরকারিভাবে কোনো নতুন স্বাধীনতা দিবস বোঝানো হয় না। তবে কিছু মানুষ ও রাজনৈতিক আলোচনায় এই তারিখটিকে একটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একটি জাতির অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় জনগণের আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। তেমনই সাম্প্রতিক ইতিহাসে ৫ আগস্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে আলোচিত হয়ে ওঠে। এদিন দেশের চলমান আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে একটি বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। যেখানে ছাত্র জনতা ও পরবর্তিতে দেশের সকল জনগণের অংশগ্রহণের ফলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ক্ষমতায় থাকা এক রাজনৈতিক দলের পতন হয়। দেশের ভেতরে স্বৈরাচার বা অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। ২৬ মার্চ ১৯৭১ এবং ৫ আগস্ট ২০২৪-এর স্বাধীনতার মধ্যে মিল হলো–উভয় ঘটনাতেই জনগণ অন্যায় ও দমনশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, সাহসিকতা ও ত্যাগ দেখানো হয়েছে, এবং জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেম বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই দিনই বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতীক।

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের চেতনা প্রদান করে, আর ৫ আগস্ট আমাদের স্বৈরাচারী সরকারের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে এক স্বাধীনতার আনন্দ উপহার দেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দুই তারিখ আমাদের জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতি দায়িত্ববোধকে শক্তিশালী করে। এটি আমাদের শেখায় যে স্বাধীনতা কেবল অর্জন করার বিষয় নয়, তা রক্ষা ও সমুন্নত রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা প্রতিটি বাঙালি এই দুই দিনকে স্মরণ করি, কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সকল শহীদ ও মুক্তিকামী মানুষের প্রতি যারা আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন এবং আমাদের আজকের স্বাধীন বাংলাদেশকে সম্ভব করেছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা এবং ৫ আগস্টের স্বাধীনতা–এই দুটি কথাই অনেক সময় আলোচনায় আসে, কিন্তু এদের অর্থ ও প্রেক্ষাপট এক নয়। নিচে সহজভাবে পার্থক্যটি দেওয়া হলো।

১. ২৬ মার্চের স্বাধীনতা

- এটি বাংলাদেশের আসল ও আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা।
- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়।
- এই স্বাধীনতা ঘোষণার দু'জন মহান ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হয়।
- এরপর প্রায় ৯ মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।
- এই দিনটি বাংলাদেশে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

২. ৫ আগস্টের স্বাধীনতা বা জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস।

- ৫ আগস্ট বাংলাদেশের কোনো সরকারি স্বাধীনতা দিবস নয়।
- সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আলোচনায় বা কিছু মানুষের বক্তব্যে এটি ব্যবহার করা হয় একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন বা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে।
- এটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মতো কোনো নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা নয়।

স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হয়। প্রথমত, স্বাধীনতা ব্যবহার করতে হলে দায়িত্বশীল হতে হবে। নিজের কাজের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের আইন ও নিয়ম মেনে চলতে হবে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করতে হবে শালীন ও সম্মানজনকভাবে, শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে হবে, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করা উচিত। এছাড়া অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সম্মান করতে হবে। যারা স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদোক্ষেপ নেয়া উচিৎ।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট (ChatGPT)

আঠারগ্রামের বাঁশ

ড. ইসিদোর গমেজ

শিরোনাম দেখে চমকে উঠবেন না। আসলেই আমি আজ আঠারগ্রামের বাঁশ নিয়ে লিখতে বসেছি। আঠারগ্রামের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, খাবার-দাবার, জমকালো সব অনুষ্ঠান - বিয়ের সম্বন্ধ করতে মন মন দুধ-মিষ্টির ডালা, ধোয়ানী, বিয়ের চলনে ঘোড়া, সপ্তাহব্যাপি কনের বাড়ি সবান্ধব ফিরানী, ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা ছিল আঠারগ্রামের ব্যতিক্রমধর্মী ঐতিহ্যের ইতিহাস। এসব নিয়ে লেখা লেখি গল্প-কথা আছে। তবে আঠারগ্রামের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে গল্প কবিতা ইতিহাস রচনা খুব একটা দেখা যায় না। আজকাল আমাদের আঠারগ্রামের শিকড়ের সন্ধানমূলক রচনায় অনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা জানি আঠারগ্রামের চারটি ধর্মপল্লী ও উপ-ধর্মপল্লী প্রাচীনতম ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত। শুলপুর, গোল্লা, বক্সনগর, হাসনাবাদ, ইকরাশী, ইমাম নগর, নয়ানগর, নয়নশ্রী, রাহুতহাটি, দেওতলা, ছোট গোল্লা, বড় গোল্লা, পাদ্রিকান্দা, কাশিনগর, তুইতাল ও সোনাবাজু গ্রামের মানুষের যাতায়াতের পথ ছিল ইছামতি নদীর উজান ভাটিতে। নদী বিধৌত, বিল, গভীর জলের বিস্তৃর্ণ আমন ক্ষেতের মাঠঘেরা আঠারগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল অনন্য- বর্ষায় এক রকম, আর শুকনো মৌসুমে সম্পূর্ণ বিপরীত।

আজ আমার লেখার বিষয় হলো বাঁশ। একসময় আঠারগ্রামের প্রতিটি বাড়িতেই বাঁশ ঝাড় ছিল। সাংসারিক কাজে বাঁশের ব্যবহার ছিল অত্যাবশ্যক। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আঠারোগ্রামের প্রত্যেক পরিবারের রান্না ঘর, ঢেঁকির ঘর, গোয়াল ঘর, নির্মাণে কাঠের চেয়ে বাঁশের ব্যবহার ছিল বেশি।

হাঁসমুরগী আটকানোর জন্য টাপা, পলো, মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার ফাঁদ- দুয়াইর, বইচনা, মাছ ধরে জিলানোর জন্য খইচা, খালুই, কৃষকের মাথালী, গরুর খুঁটি, হালের মই, জোয়াল, গরু মহিষের টুনা, মাছ শিকারের ট্যাটার কুড়া, কোঁচ, জুঁতির শক্ত কুরা সব কাজেই বাঁশ ছিল উত্তম।। বসত ঘরের বারান্দার জাফরি বেড়া, রৌদ্রের তাপ প্রতিরোধে ঘরের চালের নীচে বাঁশের চাটাই, -----, ধান শুকানোর হারপাটের হাতল, ধানের খড় শুকানোর/নাড়া-চাড়ার জন্য কাড়াইল বাঁশ, গাছে/ঘরের চালে উঠার জন্য চঙ্গ (মই), ঘুড়ি বানানো কামানি, গভীর জলে স্রোতের বিপরীতে নৌকা বাওয়ার জন্য লগি, নৌকার মাচাইল, পাটাতন, রাঁধুনীদের নিত্য-ব্যবহার্য কুলা, চালুন, বেলচা, আইক্যা, নাহের, চেইমচা, ছাইদাড়ি, বাঁশের ঝাড়ু, উড়া, চাঙ্গারী, উচা ইত্যাদি। ডুবা ও নদীবিধৌত এলাকায় ছোট বড় মাছ ধরার হরেক রকম ফাদের ব্যবহার ছিল, যেমন চাঁই দুয়াইর, দুই পাড় ওয়ালা বেতির দুয়াইর, বইচন্যা, শলার বড় দুয়াইর চোঙ্গা। নাবানী, বানা, ধারি, আইল্যা নড়ি (মাথায় সরু পেড়েক), হাত পাখা, চুঙ্গা, বাঁশের গাইন্জা, বাঁশের আড়া, দেশী নৌকার বাঁশের মাস্তুল, পালের ডেঙ্গী, কেরাইয়া ও বড় নৌকার ছই (ছাপ্পর), বেঁদে নৌকায় বাঁশের ছই-ঘর, গয়না নৌকার দাঁড়, বাঁশের বৈঠা, গ্রামে-গঞ্জে বাঁশের পায়খানা, বাঁশের ব্যাড়া, মাছের খাড়ি। গরুর আতাল, ঘরের পিড়া ও বাড়ির ভাঙ্গুনি রক্ষায় বাঁশের গুড়ানী, বাঁশের বাঁধ, বেড়ি বাঁধ, বাঁশের সাঁকো, জাফরি ব্যাড়া, ভেসাঁলের বাঁশ, বিভিন্ন প্রকার খুঁটি, কুঁড়ে ঘরের খুঁটি, মাছ শিকারে মাছের ঘের, ঝাটা আটকানোর জন্য বাঁশ, বড়শির ছিপ, ঘুড়ির লাটাই। এখন বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পণ্য হলো হাজার রকমের কুটির শিল্পের সামগ্রী। এর বৃহৎ একটি অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়।

আঠারগ্রামের প্রতিটি বাড়িতে ও পরিবারে এখনও বাঁশের ব্যবহার খুবই সাধারণ। আমাদের এলাকায় আদিকাল থেকে ৩/৪ প্রকার বাঁশ জন্মায়। যেমন- বড়াক বাঁশ, জাওয়া বাঁশ, ওঁড়া বাঁশ এবং তল্লা বাঁশ। এছাড়া বর্তমানে কিছু পাহাড়ি বাঁশের আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে মুলি বাঁশ ও ডেকোরেটিভ বাঁশ উল্লেখযোগ্য। জাওয়া বাঁশ আবার তিন চার রকমের হয়। কালি জাওয়া, ছিটা জাওয়ার চাহিদা বেশী। একেক প্রকার বাঁশের ব্যবহার একেক রকম। বড়াক বাঁশ অনেক মোটা, লম্বা ও দলাই (পুরু) হয়ে থাকে। ভেসালের জাল আটকানোর জন্য এই বাঁশ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ঘরের খুঁটি, বাড়ির বাউন্ডারী ও জেলেদের বিভিন্ন কাজে বড়াক বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য্য। উঁড়া বাঁশ বেশ মোটা, কিন্তু কিছুটা ফাঁপা হয়ে থাকে। উঁড়া বাঁশের কঞ্চি খুব মোটা ও লম্বা হয়ে থাকে। সেজন্য আমাদের বাংলায় একটি প্রচলিত কথা হলো, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"। ওঁড়া বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মাটি টানার শক্ত উড়া, টাপা, ধামা, মোড়া--- বানানো হয়। বাঁশের বুক শেলফ, ডুলি, বড় মাথালী, ছোট মাথালী, ধানের গোলা, সভা সমাবেশের মঞ্চ, ডেকোরেটরের বাঁশ, বাঁশের তোরণ, কেল্লা, গেইট, বাঁশের ভেলা, বাঁশের চালি, আরো কত কি আছে বাঁশের। জাওয়া বাঁশের সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় গৃহস্থালী কাজের নানাবিধ সামগ্রী তৈরী করতে।

বাঁশের কেল্লার ঐতিহাসিক কাহিনী আমাদের অনেকের জানা। ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন বাংলার ইতিহাসের কিংবদন্তী তিতুমীর। তার সংগ্রামের একটি বিশেষ অধ্যায় ছিল "বাঁশের কেল্লা নির্মাণ"। ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর বারাসাতের কাছে বাদুড়িয়ার ১০ কিলোমিটার দূরে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর বাঁশের কেল্লা তৈরী করেন। বাঁশ ও কাঁদা দিয়ে দ্বিস্তর বিশিষ্ট এই কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। সৈয়দ মীর নিসার আলী (২৭ জানুয়ারি ১৭৮২-১৯ নভেম্বর ১৮৩১), যিনি তিতুমীর নামে বেশী পরিচিত।

আজ থেকে ৬০/৭০ বছর আগে আঠারগ্রামের অনেক পরিবারের অর্থের যোগান দিত বাঁশ। আমার এক আত্মীয়া খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তাঁর দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে তিনি সংসারের খরচ চালিয়েছিলেন বাঁশ বিক্রি করে। তাদের ১৪/১৫ টি বাঁশ ঝাড় ছিল। তাদের বাঁশ ছোপের/ঝাড়ের মধ্যে ৩/৪ টি ছিল বড়াক বাঁশের। বিশাল লম্বা ও মোটা- ভেসালের জন্য উপযুক্ত বাঁশ। ষাট/সত্তর বছর আগে জেলেদের কাছে এক জোড়া বড়াক বাঁশ বিক্রি করতেন পাঁচ/ছয় টাকায়। তখন একটা বড় ইলিশ মাছের দাম ছিল দেড়/দুই টাকা, বান্দুরা হলিক্রশ স্কুলের ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল দুই তিন টাকা। এরকম আঠারগ্রামের

অনেক পরিবারের, বিশেষতঃ হাসনাবাদ, মোলাশীকান্দা, ইকরাশী, বড় গোল্লা, ছোট গোল্লা, দেওতলা, বক্সনগর গ্রামের অনেক পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল তাদের বাড়ির বাঁশ। সবচেয়ে মজার ব্যপার হলো আঠারগ্রামের আদিভূমি মালিকান্দা, ঝন্‌কি, সুতাপাড়া এলাকা এবং নাগেরকান্দা গ্রামেও বাঁশ ঝাড়ের আধিক্য ছিল। এখনও তার চিহ্ন বিদ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে এখন যে সকল বাঁশ ঝাড় বিদ্যমান সেগুলোর ইতিহাস বাবা, ঠাকুরদাদার আমলের। বর্তমানে খুব কম বাড়িতেই নতুন করে বাঁশ রোপন করা হয়। বরং বাড়িতে নতুন নতুন দালান কোঠা নির্মাণের কারণে অনেক বাঁশ ঝাড় কেটে ফেলা হচ্ছে। তারপরও এখনো হাসনাবাদ, মোলাশীকান্দা, বড়গোল্লা, ছোট গোল্লায় অনেক বাঁশ ঝাড় আছে। প্রকৃতপক্ষে বাঁশ একটি অর্থকরি ফসল। এর উপযোগীতা, চাষাবাদ, সংক্রান্ত বিষয়ে পরে কখনও লেখা হবে।

বাঁশ নিয়ে কবিতা, ছড়া, গান আছে অনেক---- "বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ, মা গো আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই!" কবিতাটা আমাদের কার না জানা আছে! দেখ কবি বাঁশ ঝাড়কে বাগানও বলেছে। এপ্রসঙ্গে পঞ্চাশ বছর আগের একটা ঘটনা/অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম স্যারকে নিয়ে গিয়েছিলাম আঠারগ্রামে। এই স্যারকে প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী যমের মত ভয় করতো। ক্লাশে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পাংচ্যুয়াল এবং সিরিয়াস। কোন ফাঁকিজুকি চলত না। ছোট খাটো ফর্সা ও সৌম্যকান্তি চেহারা। তাঁকে সবাই চিনতো ডিএনআই (DNI) স্যার বলে। কিভাবে আমি তাঁর স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম জানি না। আমরা কয়েকজন আবিষ্কার করেছিলাম, স্যারের একটি কোমল ও রসিক মন আছে। স্যারও কবিতা লিখতেন। আমাদের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পাঠের একটি অংশ ছিল, উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও এক্সকারশন (Excursion)। স্যারের সাথে আমার সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে এটা বেশী কাজ করেছে। আমাদের আঠারগ্রাম অঞ্চলের খাল, বিল, ধানখেত, ডোবা-নালা থেকে বিভিন্ন প্রকার শৈবাল ও শ্যাওলা সংগ্রহ করে আমি তাঁকে দিতাম। তিনি সেগুলোকে আইডেন্টিফাই/সনাক্ত করতেন। এভাবে তিনি দেখলেন আঠারগ্রামের এলাকায় অনেক অজানা অনাবিষ্কৃত উদ্ভিদ আছে। ফলে আঠারগ্রাম পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমিও স্যারকে আমাদের এলাকায় নেয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হলো বর্ষাকাল, যখন ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, বিল-ঝিল ধানক্ষেতে শ্যাওলার আধিক্য দেখা যায়- এমনকি বাড়ির উঠানে ও ঘাটলায় পিচ্ছিল জেলীর মত শ্যাওলা জন্মায়।

ইতোমধ্যে আমাদের বিভাগে আমার সহপাঠী ফ্রান্সিস মেন্ডেস ও (খোকন) স্যারের প্রিয় ছাত্রতে পরিণত হয়েছে। তাই খোকনকেও সাথে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সেপ্টেম্বর মাসের ছুটির দিনে আমাদের আঠারগ্রামে নিয়ে যাওয়া স্থির হলো। তখন (১৯৭৫ খ্রিঃ) আঠারগ্রামের বর্ষাকালে যাওয়ার একমাত্র ভাল যানবাহন ছিল লঞ্চ। সদরঘাট থেকে লঞ্চে বান্দুরা যেতে ৫/৬ ঘন্টা সময় লাগতো। একদিনে স্পেসিমেন সংগ্রহ ও এলাকা পরিদর্শন করে ঢাকা ফেরা সম্ভব নয়। তাই স্যারকে গোল্লা গির্জায় ফাদারের ঘরে

এবং আমরা দু'জন কাছেই আমার মাসির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করি। সে যাই হোক নির্দিষ্ট দিনে ভোরের লঞ্চে সদরঘাট থেকে রওয়ানা দিলাম তিন জন। লঞ্চ বুড়িগঙ্গা বেয়ে ফতুল্লা হয়ে ডানদিকে মোড় দিয়ে ধলেশ্বরী নদী দিয়ে উজানের দিকে চলল। আমাদের নদীপথে স্যারের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমরা দোতলার কেবিনে বসেছি। আমাদের ঢাকা টু বান্দুরা ভ্রমণটা দীর্ঘ হলেও দুই পাড়ের দৃশ্য এবং ঝাল মুড়ি ওয়ালা, সস্তা ম্যাজিক ও কিছু লোকের ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালী গান শুনতে শুনতে সময়টা আনন্দেই কেটে যায়। যেহেতু মোটামুটি ভরা বর্ষাকাল, নদী পাড়ের বাড়ি ও গাছপালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম হয়ে থাকে। সৈয়দপুর লঞ্চঘাট ছেড়ে ইছামতি নদীতে পড়ল আমাদের লঞ্চ। স্যার নির্বাক বিস্ময়ে আমাদের ইছামতি পাড়ের বাড়িঘর ও গাছপালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন। নদীর কোল ঘেষে প্রচুর বাঁশঝাড়, বরুন, হিজল, পাতি গাব গাছ। বাঁশ ঝাড়ের বাঁশ নুইয়ে পড়েছে নদীর জলে, কচুরিপানার ---আটকে আছে নদীতে পড়া বাঁশের আগায়। ছোট ছোট নৌকায় সৌখিন লোকেরা বিভিন্ন কায়দায় মাছ ধরছে। এটি আমার জন্য অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য হলেও ডিএনআই স্যারের জন্য একেবারেই ভিন্ন অনুভূতির।

দুপুর একটার আগেই আমরা গোল্লা লঞ্চঘাটে নামলাম। মাসির বাড়ি ঘাট থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। আগেই বলা ছিল মাসি ও দিদিকে। গ্রামের বাড়ি, তখনও আঠারগ্রামে পাকা ঘরবাড়ি দালানকোঠা ছিল না। মাসির বাড়িতে একটি চৌচালা টিনের কাঁচা ভিটির ঘর, একটি দোচালা টিনের ঘর, আর বড় কাঁচা উঠান। পিছনের দিকে বাঁশের ঘের দেয়া একচালা একটি রান্নাঘর। একেবারে বাঁশ ঝাড়ের কাছে বিশাল মোটা লম্বা একটি দেবদারু গাছের পাশে বাঁশ, টিন, কাঠের পায়খানা। আমার অনেক সংকোচ হচ্ছিল স্যারকে প্রথমে এই বাড়িতে উঠাতে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় স্যার আমার মাসি ও দিদির সাথে পরিচিত হয়েই মন্তব্য করলেন, এত সুন্দর বাড়ি আপনাদের! আমরা স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললাম। আসলেই বাড়িটি ছিল তখন নানারকম গাছ-গাছালিতে ভরা। রাস্তার ধারে বড় বড় আম গাছ, কয়েকটি জাম গাছ, বাতাবি লেবু, পেয়ারা, বিলাতি গাব, দেশী বড়ই, কামরাঙ্গা, কাঠ বাদাম, ছ্যাঙ্গা বা তুঁতফল গাছ। পূর্ব ও পশ্চিম পাশে খালি জায়গা, ধান-পান, লাকড়ি শুকানোর জায়গা এবং লাউ, শিম, পুঁই ইত্যাদির জাংলা বা মাঁচা। বাড়ির পেছনে, অর্থাৎ উত্তর অংশে ১৫/১৬ টি বাঁশ ঝাড়, পাতি গাব গাছ, কয়েকটি কদম গাছ। অপূর্ব সুন্দর গোছানো এক শরিকের বাড়ি। আজ ঐ বাড়িতে গেলে আমার বর্ণনার কিছুই মেলানো যাবে না। ঐ বাড়িতে এখন একটি চিলেকোঠাসহ একতলা দালান, একটি বড় সেমিপাকা ঘর, রান্নার ও লাকড়ির ফ্লোর পাকা আলাদা ঘর। বাড়ির সামনের হালট এখন পিচ ঢালা রাস্তা, ইজি বাইক, গাড়ি, রিক্স ভ্যান চলাচলে সর্বদা মুখরিত। বাড়ির সামনে বাউন্ডারি দেয়াল, দুই সরিকের আলাদা দুটি লোহার গেইট, রাস্তার পাশে ৪/৫ টি দোকান। পেছনের বাঁশ ঝাড় কমতে কমতে ৪/৫ টিতে ঠেকেছে। তাও অযত্নে অবহেলায় খারাপ অবস্থা। তবে এখনও বাঁশ ঝাড়ে বাঁশ হয়! আঠারগ্রামের আরো কয়েকটি ফলের গাছ আছে যা তৎকালে বাংলাদেশের অন্য কোথাও খুব একটা দেখা যেতো না। যেমন, আঁশ ফল (পিচ ফল), বিলাতি গাব, কাউয়া ফল, পানি ফল (সাদা জামরুল), অরবরি, বিলম্বি। বাংলাদেশের, এমনকি ঢাকা শহরের মানুষ জানতো না আঁশফল দেখতে কেমন। এখনও আঠাগ্রামের শতকরা ষাট ভাগ বাড়িতে আঁশফল গাছ রিতিমত ফল দেয়।

আমার মাসির বাড়ির বর্ণনা দেয়ার কারণ হলো তখনকার দিনে আমাদের আঠারগ্রামের,

বিশেষভাবে বড় গোল্লা, ছোটগোল্লা, দেওতলা, পাদ্রিকান্দা, বালিডিওর, পুরাতন বান্দুরা, মহব্বতপুর, হাসনাবাদ, মোলাশিকান্দা, ইকরাশি, বক্সনগর, নাগেরকান্দা, মালিকান্দা গ্রামসমূহের শতকরা আশি ভাগ বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল প্রায় একই রকম। তখন মাসির বাড়ির নামটি ছিল "ফটিংগার বাড়ি", এখন সেই বাড়ির নাম হয়েছে "আন্তনির বাড়ি"।

আবার ফিরে যাই আমাদের ডিএনআই স্যারের আঠারগ্রাম পরিদর্শনের কাহিনীতে। আমার মাসির বাড়িতে দুপুরের আহার সেরে একটু বিশ্রাম। তারপর আমরা নৌকায় ইছামতি নদী পাড় হয়ে পুরাতন বান্দুরা গ্রামে যাই। ইছামতি নদীর দক্ষিণ তীরে গ্রাম দু'টির অবস্থান। গাছ গাছালি বাঁশ ঝাড়ে ঢাকা হালট দিয়ে হেঁটে বান্দুরা স্কুল হয়ে মোলাশিকান্দা-হাসনাবাদ গ্রাম আমাদের গন্তব্য। পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়ছে। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আলোর বিচ্ছুরণ। আমাদের স্যার গুণ গুণ করে কবিতা আওরাচ্ছে। চলার পথে আমাদের দৃষ্টি ঝোপ ঝাড়ের দিকে, গাছের কাণ্ডে জন্মানো ব্যতিক্রমি শ্যাওলা ও ফার্ন সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমরা বান্দুরা স্কুলের কাছাকাছি প্রাচীন চাঙলাই সড়কের কাছাকাছি চলে এসেছি। সড়কের পশ্চিম দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ- ধানক্ষেত সূর্য আরো একটু হেলে পড়েছে। আলো ছায়ার অপূর্ব সম্মিলন। স্যার হালটের মাটির উপর বসে পড়লেন, বললেন আমাকে একটু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে দাও। প্রায় দশ মিনিট পর আমরা বান্দুরা হলিক্রশ হাইস্কুলের পাশ দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলাম। স্যার বললেন, এ তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে এলে? বললাম, আমরা মোলাশিকান্দা গ্রামে প্রবেশ করেছি। স্যার বললেন, এত বাঁশ ঝাড়, কে বিশ্বাস করবে এটি একটি গ্রাম! এ যে রীতিমত বাঁশের বন! এই বাঁশের জঙ্গলে কারা থাকে? বললাম, এখানে মূলত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে, বহু বছরের পুরোনো বসতি। এরপর স্যারকে নিয়ে মোটা মোটা বড়াক, উড়াঁ, লম্বা লম্বা জাউয়া বাঁশে ঢাকা হালট দিয়ে হাসনাবাদ গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমাদের আঠারগ্রামের মানুষ স্বাভাবিকভাবে অতিথি পরায়ন। খবর না দিয়ে যাওয়ার অভিযোগ শুনতে হলো। স্যার বাড়ির গাছ পালা, বাঁশঝাড় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। অনেক কিছু জানতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বাঁশ বনের ভিতরে বাস করতে ভয় করে কি না। কথা বলতে বলতে আঠারগ্রামের বান্দুরা বাজারের সহদেবের বিখ্যাত রসগোল্লা এসে গেল। আমাদেরকে কাঁচা বারান্দায় বাঁশের মোড়ায় বসতে দেয়া হলো। রসগোল্লা খেয়ে স্যার বললেন, আমি জানতাম নাটোরের মিষ্টি সবার সেরা, এখন দেখছি তোমাদের বান্দুরার মিষ্টি আরো ভাল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাত্রি যাপনের জন্য আমাদের গোল্লা ফিরে যেতে হবে। আমরা বাঁশ বন পেরিয়ে বান্দুরা নদীর ঘাটে এসে কেরাইয়া নৌকা ভাড়া করলাম। কেরাইয়া নৌকার বাঁশের তৈরী ছই/ছাপ্পর এর ভিতর দিয়ে গিয়ে স্যার পিছনের গলুইর কাছে চাড়টে বসলেন। দৃষ্টি তাঁর ইছামতির দুই পাড়ের দিকে। ভাটির স্রোতে আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা গোল্লা গ্রামে গিয়ে পৌঁছালাম। তারপর হাতমুখ ধুয়ে রাতের খাবার খেয়ে স্যারকে দিয়ে আসলাম গোল্লা গির্জার ফাদারের বাড়িতে। সেখানে একজন বিদেশী ফাদার ছিলেন, মনে হয় জার্মান ফাদার ক্লাউস বয়েরলে। তিনি স্যারকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। স্যার সেখানেই রাত্রি যাপন করলেন। আমরা দু'জন ফটিংগা বাড়িতে থাকলাম। পরের দিন সকালে গির্জায় গিয়ে দেখি ফাদার এবং স্যার ব্রেকফাষ্ট সেরে গল্প করছেন।

আমরা আবার আমাদের কাজে বের হলাম। গোল্লা গির্জার বড় খেলার মাঠ। বৃষ্টিতে পানি জমেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানারকম শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ। জেলীর মত দলা দলা ঘাসের সঙ্গে আঁটকানো। সংগ্রহ হলো যথাযথভাবে। অবাক কাণ্ড হলো, স্যার খালি পায়ে হাঁটছেন। মাঠ পেরিয়ে আমরা বড় গোল্লা গ্রামের দক্ষিণ হাটিতে প্রবেশ করলাম। হাসনাবাদ এলাকার মত গোল্লা গ্রামের বাড়ি ঘর চতুর্দিক বাঁশ ঝাড় দিয়ে ঘেরা নয়। বাঁশঝাড়গুলো কিছুটা নিয়ন্ত্রিত/পরিকল্পিত ভাবে, অর্থাৎ বাড়ির পিছনে। একটু এগিয়ে হালটের বাঁ পাশে বড় উঠানওয়ালা বাড়িটিতে গিয়ে উঠলাম। তাদের উঠানটি নীলাভ সবুজ হয়ে আছে শ্যাওলায়, বেশ পিচ্ছিল কারণ সেখানে প্রচুর নসটক জাতীয় শৈবাল জন্মেছিল। বাড়িটি বেশ পুরানো বিধায় সেখানকার নারকেল, কাঁঠাল, বেল, আঁশফল, জাম ও গাব গাছ এবং বাঁশ ঝাড় থেকেও কিছু স্যাম্পল সংগ্রহ করা হলো। দুপুরের আগেই আমাদের সংক্ষিপ্ত এক্সারসন শেষ করলাম। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা দুইটার লঞ্চে গোল্লা থেকে ঢাকা রওনা হয়েছিলাম।

এভাবেই প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম (পরবর্তীতে ডিন ও জাতীয় অধ্যাপক) স্যারকে আঠারগ্রামের বাঁশবন ও প্রকৃতি দেখিয়েছিলাম। তিনি সেখানে নতুন কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই পরের বছর আবারও তাঁকে সংগ্রহ অভিযানে আঠারগ্রামে নিতে হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। বান্দুরা লঞ্চ ঘাটে নেমে কেরাইয়া নৌকায় ইছামতি নদী ছেড়ে উত্তর পাড়ে অবস্থিত নয়নশ্রী ও রাহুতহাটি গ্রামের ভিতর দিয়ে বহমান হিজল, বরুন, কদম ও বাঁশঝাড় বেষ্টিত ছোট খাল বেয়ে বিস্তীর্ণ ঘন আমন ক্ষেতের পাশ দিয়ে শৈল্লার চক/বিলের মধ্য দিয়ে তুইতাল গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতেই দুইদিন রাত্রি যাপন করেছিলেন। এবার আমার আরেক সহপাঠি রুহুল আমিন সাথে ছিল। তখনকার দিনে বর্ষাকালে তুইতাল এলাকার প্রায় সব বাড়ি ঘর পানি দিয়ে ঘেরা থাকত। সেসময় আমাদের চলাচলের প্রধান বাহন হয় ডিঙ্গী ও কোষা নৌকা। শতকরা নব্বইটি পরিবারের নিজস্ব নৌকা থাকত। দূরে হাট-বাজারে ও বেড়াতে যাওয়ার জন্য বাঁশের ছইওয়ালা আরামদায়ক এক মাল্লার কেরাইয়া নৌকা ভাড়ায় পাওয়া যেতো। আমাদের একটি কোষা ও একটি ছোট গলুইওয়ালা ডিঙ্গী নৌকা ছিল।

আমাদের সংগ্রহ অভিযানের লক্ষ্য ছিল ভরা বর্ষার পর বিল ও চকের মধ্য দিয়ে গভীর পানির ধান ক্ষেত ও তৎসংলগ্ন ডুবন্ত মাঠের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাাকৃতিক পরিবেশ বা ইকলোজি পর্যবেক্ষণ করা।

পরের দিন সকাল সকাল আমরা তিন জন আমাদের কোষা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পরলাম। দশ হাত লম্বা খোলা কোষা, সামনে পিছনে কাঠের পাটাতন, মাঝ খানে তিনটি বাঁশের মাচাইল, নৌকার গুরার উপরে পর পর স্থাপিত। একটির অর্ধেক খুলে নৌকার খোলে জমে উঠা পানি সেচনি দিয়ে বাইরে ফেলা হত। নৌকার পেছনের মাঝি আমি। আমার বন্ধু রুহুল সামনের চাড়টে বসা, হাতে একটি বাঁশের বৈঠা। স্যার বসলেন মাঝখানে বাঁশের মাচাইলের উপর।

আমাদের গন্তব্য সোনাবাজু গ্রাম। ইছামতির তীরে অবস্থিত সর্বপশ্চিমের আঠারগ্রামের অংশ এই গ্রামটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের সংস্কৃতি প্রায় অভিন্ন। তুইতাল থেকে সোনাবাজু গ্রামের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। সোজাপথে বিল, চক-পাথারের উপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে যেতে এক ঘন্টার বেশী সময় লাগে। যেহেতু আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য জলজ পরিবেশ ও শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহ তাই আমাদের নৌকা বেয়ে চললাম গ্রামের ডুবন্ত রাস্তা, মাঠ ও ধান ক্ষেতের পাশ/ভিতর দিয়ে। তুইতাল গ্রাম ছেড়ে প্রথমে পড়ল বকচর গ্রাম ও চক, তারপর শেরপুর ও সুজাপুর। আমরা শাখারীখোলা বিলের গভীর পানির আমন ধানের ভিতর (দাওয়া) দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলছি। সেখানে পানির গভীরতা ৮/১০ ফুট। জলজ উদ্ভিদে, যেমন- বাইচা, দুলদুলা, সাধারন শাপলা, হুদ্দি শাপলা, গাংকলা, কয়েক রকমের পানা, কচুরিপানা ইত্যাদি নৌকা চালানায় বাঁধা সৃষ্টি করছিল। সেজন্য নৌকায় বাঁশের লম্বা লগি নেয়া হয়েছিল। লগি হলো এরকম পানির রাস্তায় উপযুক্ত হাতিয়ার/যন্ত্র। স্যার নিবিষ্টমনে দেখছেন কোথায় কাঙ্খিত জলজ উদ্ভিদ ও

শৈবাল পাবেন। আমন ধানের জমিতে হয় আড়ালি নামের আগাছা, যা গরুর উত্তম খাদ্য। এরকম পরিবেশে আড়ালি ও ধানের ডুবন্ত গোছায় লেগে থাকে শামুক, শামুকের গায়ে থাকে শ্যাওলা, ভেসে থাকে কত রকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডায়াটমস,---- আমাদের স্যার মাঝে মাঝেই তাঁর হাতটি নৌকার কান্দার বাইরে পানির মধ্যে জলকেলির মত নাড়াচাড়া করছেন। ভাদ্র/আশ্বিনের কাঠফাটা রোদ, কিন্তু তিনি সবকিছুকে উপেক্ষা করে প্রকৃতিকে উপভোগ করছেন। আমাদের সংগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য। দুপুর নাগাদ আমরা বিল ঝিল ছেড়ে শিকারীপাড়া গ্রামের ভিতর দিয়ে ইছামতি নদীতে পড়লাম। শিকারীপাড়া গ্রামটিও পুরানো বাঁশ ঝাড়ে ভরা ছিল। নদীর পশ্চিম/দক্ষিণ পাড়েই সোনাবাজু গ্রাম। মুলত খ্রিস্টান প্রধান। ছোট্ট গ্রাম, কিন্তু সব বাড়িগুলোই গুছানো। সোনাবাজু গ্রামের মেয়ে কল্যানী ডি' কস্তা তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এর ছাত্রী। আমরা তাদের বাড়ির নদীর ঘাটে নৌকা ভেরালাম। বিশ্রাম ও আনুষঙ্গিক কাজ ছিল। আমরা কল্যানীকে জানিয়ে যাইনি। তখনতো মোবইলের যুগ নয়। ঐ গ্রামে তখনও বিদ্যুতই যায় নি। আমাদের দেখে, স্যারের পরিচয় জেনে কল্যানী অত্যন্ত খুশি হলো। আমাদের আপ্যায়নও করল। তাদের বাড়ির পরিবেশ দেখেও স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন। ওদের বাড়িতেও সেই আঠারগ্রামের চিরচেনা বাঁশ ঝাড়, আঁশফল, গাব গাছ, কামরাঙ্গা গাছ দেখা গেল। কল্যানীদের বাড়ির বাতাবি লেবু (জাম্বুরা) গাছে অনেক বড় বড় ঝুলন্ত ফল স্যারকে বিমোহিত করেছিল। কয়েকটি বাতাবি লেবু উপহারও পাওয়া গিয়েছিল। কিছুটা বিশ্রামের পর আমরা ইছামতি নদী বেয়ে তুইতালের দিকে রওয়ানা হলাম। এবার স্রোতের ভাটির টানে নৌকা দ্রুত গতিতে চালিয়ে চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই তুইতাল পৌঁছে গেলাম।

আঠারগ্রামের কেন্দ্রস্থল হাসনাবাদ থেকে প্রায় ২০ মাইল পূর্বদিকে আদি ইছামতি নদীর তীরে আরো একটি খ্রিস্টান ধর্মপল্লী আছে, নাম শুলপুর, সেটিও আঠারগ্রামের অংশ। শুলপুর, মজিদপুর ও বড়ইহাজি এই তিনটি গ্রাম নিয়ে শুলপুর মিশন গঠিত। নদীর দুই পাড়ে তিনটি গ্রাম। কৃষ্টি ও কথাবার্তায় (ডিয়ালেক্ট) আচার আচরণে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও প্রাকৃতিক ও সামাজিক গঠন প্রায় একই রকম। সেখানেও প্রতিটি বাড়ির পালানে ও আঙ্গিনার আশে পাশে আঠারগ্রামের উল্লিখিত গ্রামগুলির মত বাঁশ ঝাড় ছিল। তারাও আমাদের মত দৈনন্দিন কাজে বাঁশ ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে বিক্রি করে ক্যাশ টাকা উপার্জন করে। বাঁশঝাড় হলো বক, শালিক, বাদুরসহ আরো অনেক পাখি বসবাসের অভয়ারণ্য।

আঠারগ্রামের বাঁশ নিয়ে এতক্ষণ আমি যা বর্ননা করেছি তা নিশ্চয়ই সহজ বোধগম্য হয়েছে। কিন্তু উপসংহারে আমার নিজের একটা বিশেষ ব্যাখ্যা/মত আছে। আমরা অনেকেই জানি আঠারগ্রামের মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বেশ কিছু বৃক্ষের/ফলের ও খাবারের সাথে পর্তুগীজ নাম জড়িয়ে আছে। আঠারগ্রামের সবকটি গ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, বাঁশঝাড় ও কিছু কিছু বৃক্ষ। এটি আমাদের আঠারগ্রামের মানুষের আদি ও একই উৎসের নির্দেশনা দেয়। কেউ এ বিষয়ে গবেষণা করে দেখতে পারে।

উপসংহারে বলতে চাই, বাঁশ বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র জন্মায় এবং ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে বাঁশ জন্মে। বাঁশের ব্যবহার ও উপকারিতা বর্ননা করে শেষ করা যাবে না। তবে আমাদের দেশের ব্যবহারের ব্যাপকতা বিভিন্ন রকমের।

আমাদের আঠারগ্রামের মানুষ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কথার বাঁশ ব্যবহার করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে তার স্বজন বা বন্ধুর প্রতি রুষ্ট হয় তখন বলে "তোমাকে আমি বাঁশ দিবো"। বাস্তবে আঠারগ্রাম সমাজে বাঁশ দেয়ার প্রচলন এখনও আছে। কেউ কেউ আর একটু বাড়িয়ে আইক্কা বাঁশের কথা বলে!

আমাদের প্রিয় বাবা,

তুমি আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়, সাহস আর ভালোবাসার নাম। তোমার স্নেহ, ত্যাগ আর পরিশ্রমের ঋণ কোনোদিন শোধ হবার নয়। আজ তুমি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস তোমার শিক্ষা, আদর্শ আর ভালোবাসা প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের পথ দেখাবে।

তুমি শিখিয়েছিলে সততা, পরিশ্রম আর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মূল্য। তোমার হাত ধরে চলতে শিখেছিলাম, আর আজ তোমার স্মৃতিকে বুকে নিয়ে পথ চলি। তোমার অনুপস্থিতি আমাদের জীবনে এক অপূরণীয় শূন্যতা, কিন্তু তোমার প্রর্থনা আর আশীর্বাদ আমাদের সাহস জোগাবে।

আমার বিশ্বাস তোমার আদর্শ ও সততার জন্য ইতোমধ্যে তুমি স্বর্গে স্থান করে নিয়েছো। আমরা দেখেছি একেই সঙ্গে তুমি পেয়েছো অগণিত মানুষের ভালোবাসা ও রাজকীয় বিদায়। তোমার প্রতি যারা এতো ভালোবাসা দেখিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই প্রাণঢালা ভালোবাসা। বাবা তোমার শুন্যতা প্রতিটি মুহূর্ত কাঁদায়!

বাবা, তুমি আমাদের হৃদয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবে।

তোমার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

মাইকেল ও পরিবারবর্গ।

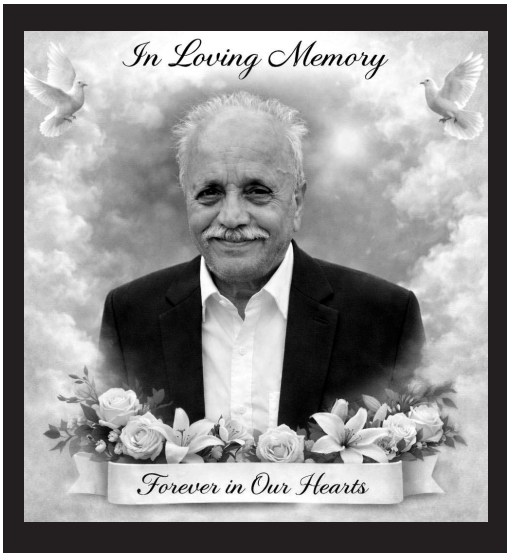

মিঃ আন্দ্রিয় বিরাজ বিশ্বাস।

জন্মঃ ১৫ জুলাই, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যুঃ ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/৫৬/২৬

আমাজনের তীরে নটর ডেমের পদচিহ্ন: COP-এ এক সবুজ অঙ্গীকারের গল্প

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রাজিলের বেলেম শহর পরিণত হয়েছিল বিশ্বপরিবেশ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘের ৩০তম জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন– COP-30। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলনে নটর ডেম কলেজ থেকে চার সদস্যের একটি দল অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। উক্ত দলের নেতৃত্বে ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ, ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও ও কলেজের শিক্ষক ও নটর ডেম কলেজ ন্যাচার স্টাডি ক্লাবের মডারেটর বিপ্লব কুমার দেব। আর বাকি দু'জন নটর ডেম কলেজ ন্যাচার স্টাডি ক্লাবের সদস্য ও কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থী।

আমাজন অরণ্যের সান্নিধ্যে অনুষ্ঠিত এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা, নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী ও যুব প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছিলেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে। সেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে গর্বের সঙ্গে উপস্থিত ছিল বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

কলেজের পরিবেশ-সচেতন শিক্ষার্থীদের সংগঠন নটর ডেম ন্যাচার স্টাডি ক্লাবের প্রতিনিধিদল পাড়ি জমায় Belém, Brazil-এ। এটি কেবল একটি আন্তর্জাতিক সফর ছিল না; এটি ছিল এক নৈতিক দায়িত্বের যাত্রা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তারা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছে আমাদের দেশের বাস্তবতা–ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসযজ্ঞ, উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, নদীভাঙনের বেদনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম।

COP-30-এ আলোচনার কেন্দ্রে ছিল কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, জলবায়ু অভিযোজন, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অর্থায়ন, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের কৌশল। নটর ডেম কলেজের প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষ করেছে কিভাবে বৈশ্বিক নীতি প্রণয়ন হয়, কিভাবে ছোট-বড় সব দেশের কণ্ঠ একত্র হয়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা অংশ নিয়েছে বিভিন্ন সেশন, সাইড ইভেন্ট ও যুব ফোরামে; মতবিনিময় করেছে বিশ্বের নানা দেশের তরুণ প্রতিনিধিদের সঙ্গে; শিখেছে যে জলবায়ু সংকট কোনো একটি দেশের সমস্যা নয়–এটি সমগ্র মানবজাতির চ্যালেঞ্জ।

আমাজনের বিস্তৃত সবুজের সামনে দাঁড়িয়ে তারা উপলব্ধি করেছে–বাংলাদেশের উপকূলের কান্না আর আমাজনের বনভূমির আর্তনাদ একই সূত্রে গাঁথা। পৃথিবী একটাই, আর তার রক্ষা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। এই উপলব্ধিই তাদের মনে জাগিয়েছে এক নতুন অঙ্গীকার–শুধু সচেতন হওয়া নয়, পরিবর্তনের অংশ হওয়া।

নটর ডেম কলেজের শিক্ষা-দর্শন জ্ঞান, নৈতিকতা ও সেবার সমন্বয়ে গঠিত। COP-30-এ অংশগ্রহণ সেই দর্শনেরই বাস্তব প্রতিফলন। শ্রেণিকক্ষের পাঠ যখন বৈশ্বিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন শিক্ষা পরিণত হয় জীবন্ত অভিজ্ঞতায়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেনি; তারা অর্জন করেছে বৈশ্বিক নাগরিকত্বের বোধ, নেতৃত্বের সাহস এবং মানবকল্যাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা।

ফিরে এসে এই অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে নতুন উদ্যম সৃষ্টি করেছে। তারা প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যে কলেজ ক্যাম্পাসে আরও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, সচেতনতা কর্মসূচি বৃদ্ধি পাবে, গবেষণা ও প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের চর্চা জোরদার হবে। COP-30 তাদের কাছে একটি ইভেন্ট নয়–এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, একটি চেতনার জাগরণ।

আমাজনের মাটিতে নটর ডেমের যে পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে, তা কেবল উপস্থিতির স্মারক নয়; এটি ভবিষ্যতের প্রতি এক দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই তরুণ প্রতিনিধিরাই আগামী দিনের সবুজ পৃথিবীর নির্মাতা।

নটর ডেম কলেজের এই অংশগ্রহণ আমাদের শিক্ষা-দর্শনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ–বিশ্বের কল্যাণে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। COP-30-এ সেই লক্ষ্য আরও সুস্পষ্ট হয়েছে, আরও শক্তিশালী হয়েছে আমাদের সবুজ অঙ্গীকার।

ক্রুশকে ভালোবাসি

অপূর্ব জন রায়

ক্রুশের দিকে তাকিয়ে
ধ্যান করি নিরবে।
প্রার্থনা করি হে
শক্তি দাও মোরে।
ঘুঁচাও পাপ-কালিমা
শুচি করো মোরে।
থাকব তোমারই পানে
সারাজীবন ধরে।
ক্রুশকে ভালোবাসি
ক্রুশেতে জীবন সঁপি।
ক্রুশ আনে মুক্তি
ক্রুশকে ভালোবেসে
তব পাই ভক্তি।
পবিত্র ক্রুশীয় মৃত্যুবরণে
বাঁচালে মোর জীবন পাপ হতে।
মোর দুঃখ সব মোচন করে
তুমি কষ্ট সইলে নিরবে
ক্রুশকে আমি, ভালোবাসি যে।

আইসক্রিমওয়ালার ঘণ্টা

প্রতিদিন বিকেল হলেই পাড়ায় একটি পরিচিত মিষ্টি আওয়াজ শোনা যেত। টিং টিং করে বাজতে থাকা সেই ঘণ্টার শব্দ শুনলেই সবাই বুঝে যেত, আইসক্রিমওয়ালা এসেছে। বড় বড় বাড়ির সামনে ঠেলাগাড়ি থামত, আর অনেক বাচ্চা আনন্দে ছুঁটে আসত আইসক্রিম কিনতে। রঙিন কাগজে মোড়া আইসক্রিম, ঠান্ডা আর মিষ্টি, সবাই খুশি হয়ে খেত। পাড়াটা তখন হাসি আর কথায় ভরে উঠত।

এই বড় বাড়িগুলোর মাঝেই ছিল একেবারে ছোট একটি ঘর। সেই ঘরে থাকত এক মা আর তার ছোট ছেলে। তাদের জীবন ছিল খুব সাধারণ। মা কষ্ট করে সংসার চালাতেন। অনেক সময় নিজের খাওয়াও ঠিকমতো হতো না। আইসক্রিম, খেলনা বা নতুন জামা, এসব তাদের জীবনে খুব কমই আসত। তবুও মা ছেলেটাকে আগলে রাখতেন যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে।

ছোট ছেলেটার খুব ইচ্ছে হতো আইসক্রিম খেতে। প্রতিদিন বিকেলে সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। দূর থেকে তাকিয়ে দেখত আইসক্রিমওয়ালাকে, দেখত অন্য বাচ্চাদের খুশির মুখ। তার চোখে তখন স্বপ্ন আর ইচ্ছার ঝিলিক দেখা যেত। কিন্তু সে জানত, মায়ের কাছে অত টাকা নেই। তাই সে কখনো বাইরে যেত না, কিছু চাইত না। শুধু চুপচাপ জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকত।

আইসক্রিমওয়ালা একদিন বিষয়টা খেয়াল করলেন। প্রতিদিন আসেন, প্রতিদিনই দেখেন, ছোট ছেলেটা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু কখনো কাছে আসে না। তার চোখে যে কতটা ইচ্ছে আর অপেক্ষা, সেটা আইসক্রিমওয়ালার চোখ এড়ায়নি। সেদিন তিনি আর নিজেকে থামাতে পারলেন না। ঠেলাগাড়ি থামিয়ে ধীরে ধীরে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন।

তিনি খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রোজ কেন শুধু তাকিয়ে থাকো, কেন আইসক্রিম কিনতে আসো না। ছেলেটা প্রথমে একটু লজ্জা পেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তার আইসক্রিম খুব ভালো লাগে, কিন্তু তর কাছে টাকা নেই। তাই সে শুধু দূর থেকে দেখে। এই কথা শুনে আইসক্রিমওয়ালার মনটা কেমন করে উঠল। তার চোখ ভিজে গেল, বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে এল।

আইসক্রিমওয়ালা হাসিমুখে বললেন, আজ থেকে যখন ইচ্ছে তুমি আইসক্রিম খেতে পারবে। এর জন্য কোনো টাকা লাগবে না। ছোট ছেলেটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না। তার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তারপর তার মুখে ফুটে উঠল এক আনন্দের সুন্দর উজ্জ্বল হাসি। সেই হাসিটা যেন চারপাশ আলোকিত করে দিল।

সেদিন থেকে ছোট ছেলেটা শুধু আইসক্রিমের স্বাদই পেল না, পেল ভালোবাসার স্বাদও। আর আইসক্রিমওয়ালার পেলো এক গভীর মানসিক শান্তি। তিনি বুঝলেন, একটু দয়া আর ভালোবাসা কারও জীবনে কত বড় সুখ এনে দিতে পারে। আসলে, টাকা না থাকলেও মানুষের মন বড় হতে পারে। ভালো মানুষ হওয়াই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পরিচয়।

এই ছোট্ট গল্পটা আমাদের শেখায় "ভালোবাসা কখনও দামে মাপা যায় না"। সামান্য একটু ভালোবাসা, একটু বিনামূল্যের হাসি, হয়তো কারও জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার হয়ে উঠতে পারে। মনুষ্যত্বই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

পবিত্র ক্রুশ

উষান দালবত

গেৎসিমানিতে যিশুর আত্মনিবেদন,
পানপাত্রটি করে নিলেন আপন।
শত্রুরা যিশুকে করেছে গ্রেফতার,
পিলাতের মহাসভায় হলো তাঁর বিচার।
ক্রুশকে, যিশু নিজের কাঁধে নিল,
এভাবে ঈশ্বরের বাণী সত্য হলো।
ক্রুশকে যিশু করেছে আপন,
ধরণীর বুকে শুভাগমন।
যিশু ক্রুশে বাহু বাড়ায়ে,
মোদের ডাকেন তাঁর হৃদয়ে।
খ্রিস্ট যিশুর ক্রুশেতে মাথা নত,
মাতা সন্তানের কষ্ট দেখে শোকাহত।
এই ক্রুশে খ্রিস্ট যিশুর মৃত্যু হয়,
যার ফলে মোদের স্বর্গের পথ হয়।
এই ক্রুশ পরিত্রাণদায়ী,
বিশ্ব মানবের জীবনদায়ী।
ক্রুশকে মোরা বিশ্বাস করি,
যে বিশ্বাস ক্রুশ মানবের
পাপহরণকারী।
এই ক্রুশ নিখিল ভুবনের আলো,
ক্রুশ চিহ্নের নামে
মানব দীক্ষিত হলো।
ক্রুশ জীবনের পূর্ণতা লাভের পথে,
পাপের বন্দন থেকে মুক্তি পেতে।
ক্রুশকে মোরা ভালোবাসবো,
ক্রুশের পথে সদা চলবো।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

কথা গমেজ

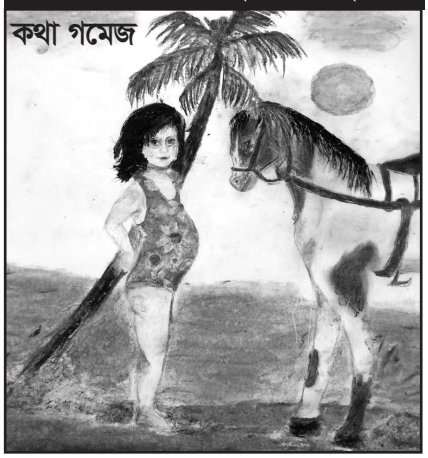

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে ওয়াইসিএস এনিমেটরদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিস্টার মেরী অন্তরা এসএমআরএ: বিগত ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে দোম আন্তনীয় পালকীয় সেবা কেন্দ্র নাগরীতে "ওয়াইসিএস চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তনের আমন্ত্রণ" এই মূলসুরের আলোকে ওয়াইসিএস (শিক্ষক) এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ৪টি অঞ্চল থেকে মোট ৪৩ জন সদস্য এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শ্রদ্ধেয় বিশপ সুব্রত বি গমেজ। বিশপ মহোদয় বলেন, এনিমেটরগণ যেন এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আরও জাগ্রত হয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে ওয়াইসিএস এর রূপান্তর আনতে পারেন। উপদেশের মধ্য দিয়ে বিশপ মহোদয় এনিমেটরদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেন। যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ, বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কার্যক্রমে খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের জন্যে ওয়াইসিএস আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর সহভাগিতা রাখেন। ওয়াইসিএস আন্দোলন: চ্যালেঞ্জসমূহের উপর সহভাগিতা রাখেন সিস্টার কাকন রোজারিও আরএনডিএম। ওয়াইসিএস এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এর আলোকে সহভাগিতা রাখেন যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি' ক্রুজ। অতঃপর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াইসিএস এর বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অঞ্চল ও ইউনিট ভিত্তিক রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ বার্ষিক অঞ্চল ও ইউনিট ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরপর ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাণবন্তভাবে ওয়াইসিএস এর চ্যালেঞ্জ উত্তরণ-এর সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরেন। ফাদার প্যাট্রিক এস. গমেজ সেল মিটিং পরিচালনা পদ্ধতি ও প্রদর্শন এর সহভাগিতা করেন ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দান করেন। অতঃপর শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্রুশের পথ ও রাতে এনিমেটরদের এনিমেশন শেখানো হয়। শেষে সমাপনী খ্রিস্টযাগের পর যুব সমন্বয়কারী ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুজ ওয়াইসিএস গঠন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল এনিমেটরদের হাতে শুভেচ্ছা স্বরূপ ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করেন।

পাগাড় ধর্মপল্লীতে শিশু ও এনিমেটরদের সহযোগে শিশু মঙ্গল সেমিনার

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ: বিগত ১৩ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার পাগাড় ধর্মপল্লীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি এবং স্বাগতিক ধর্মপল্লীর উদ্যোগে "এসো পবিত্রাত্মায় জীবন নবায়ন করি"- এই মূলসুরের আলোকে, ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে তপস্যাকালীন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ৯০ জন শিশু, ১৪ জন এনিমেটর, ৫ জন সিস্টার এবং ৩ জন ফাদার উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতেই স্বাগতিক ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার শীতল কস্তা সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পরিচালক ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া এবং সহযোগিতা করেন পাগাড় ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার শীতল কস্তা। খ্রিস্টযাগের পর সিস্টার মেরী তৃষিতা মূলসুরের আলোকে প্রাঞ্জল ভাষায় তার প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন এবং মিসেস ঝর্ণা রিবেরু (সদস্য) শিশুদের নিয়ে একশন সং পরিবেশন করেন। সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ তার সহভাগিতায় শিশুদের উদ্দেশে বলেন, দরিদ্র ও সহপাঠীদের সাহায্য করতে, মিথ্যা কথা না বলতে এবং নৈতিক ও মূল্যবোধের আলোকে নিজেদের জীবনে নবায়ন করতে। একই সাথে শিশুদের মধ্য থেকে কয়েকজন শিশু "দয়ালু সামরীয় ভ্রাতৃপ্রেমের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত" গল্পটি সুন্দর করে অভিনয় করে। এরপর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুরা পবিত্র ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করে। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশুর শেষ ভোজের ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একই সাথে তিনি ফাদারের উপদেশ ও সহভাগিতার উপর শিশু ও এনিমেটরদের বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং পালপুরোহিত বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হয়। শিশু মঙ্গল সেমিনার সার্থক, সুন্দর ও ফলপ্রসূ করার জন্য ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার শীতল কস্তা, সহকারি পালপুরোহিত ফাদার ডমিনিক রোজারিও, সিস্টারগণ এবং এনিমেটরদের সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করার মধ্য দিয়ে দিবসব্যাপী অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘটে।

LAMB – Employment Opportunity

LAMB is a well-run major mission **Hospital, Community Health Development, Training** and **Research** organization. Services cover more than 6.3 million people in North West Bangladesh.

There is a vacancy for the following contractual position under the Community Health and Development Program (CHDP).

Position: Deputy Director/ Senior Program Manager **Post: 1or2 (Male/Female)**

Job Summary: Deputy Director/Senior Program Manager will provide strategic and operational leadership to support the achievement of CHDP goals. The role supports the CHDP Director and Project Managers in planning, implementation, monitoring, and evaluation, while strengthening coordination with government counterparts, donors, NGOs, and internal teams. The position includes staff supervision, progress monitoring, and ensuring compliance with safeguarding and child protection policies.

Essential Requirements: Master's degree in a relevant field, preferably an MPH, with training in community health promotion and social determinants of health and well-being. Candidates should have a minimum of 15 years of experience in an international/national development organization, with 5 years in a supervisory position.

Key Requirements

- Proven ability to work with a wide range of international donors and effectively manage project implementation.
- Demonstrated experience in project design and proposal development.
- Strong experience in office administration and managing team.
- Hands-on experience in finance and budget management.
- Familiar with IT and data analysis tools, including Excel, MS Access, SPSS/STATA.

Age: Minimum 40 years

Salary: Minimum Tk. 75,000 per month gross but negotiable based on experience. Other benefits include, medical benefit, provident fund, festival allowance once per year, and critical illness and death benefit.

Job Location: LAMB Head office, Parbatipur, Dinajpur.

Qualified candidates are requested to apply with a cover letter along with an updated CV (mentioning two references name), all educational & experience certificates, NID and recent passport size photograph to the **HR Department, LAMB, P.O. Parbatipur, Dinajpur-5250, Bangladesh**; alternatively, email to **hrjobs@lambproject.org;** Please mention the position name on top of the envelope or with the subject line of the email.

Application Deadline: 31 March 2026.

N.B. Only shortlisted candidates will be notified. Any kind of persuasion will be considered as disqualified.

"Potential women candidates are strongly encouraged to apply"

LAMB authority holds the right to accept or reject any or all applications without giving any reasons.

LAMB is a smoke-free organization.

"At LAMB we are committed to zero tolerance of the abuse or exploitation of children and vulnerable adults."

Follow us: bdjobs.com Shomvob LinkedIn www.lambproject.org

ল্যাম্ব LAMB | যেন জীবন পরিপূর্ণ হয় That all may have abundant life | সমন্বিত পল্লী স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন Integrated Rural Health and Development

বিজ্ঞ/৫৫/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র এবছরের ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা **'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৮,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২০,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১২,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৮,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,৫০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	৩,০০০ টাকা

যোগাযোগ করুন –

বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 10
Regd. No. DA-33
❖ 22 - 28 March, 2026, ৮ - ১৪ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

মার্চ
১৭ ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্বদিবস
১৮ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও এর মৃত্যুবার্ষিকী
১৯ সাধু যোসেফের মহাপর্ব
২৫ প্রভুর আগমন সংবাদ মহাপর্ব
২৯ তালপত্র রবিবার

এপ্রিল
১ পাওলার সাধু ফ্রান্সিস
২ পুণ্য বৃহস্পতিবার
৩ পুণ্য শুক্রবার
৪ পুণ্য শনিবার
৫ পুনরুত্থান রবিবার
১১ সাধু স্ট্যানিসলাউস বিশপ এবং ধর্মশহীদ
১২ ঐশ করুণার রবিবার
২৬ বিশ্ব আহ্বান দিবস
৩০ সাধু ৫ম পিউস

মে
১ শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব
৮ পুণ্যপিতা চর্তুদশ লিও'এর পোপীয় পদাভিষেক দিবস (২০২৫)
১৩ ফাতেমা রাণীর পর্ব
১৪ প্রেরিতদূত সাধু মাথিয়াস
১৭ প্রভু যীশুর স্বর্গারোহণ মহাপর্ব
২৪ পঞ্চাশত্তমী মহাপর্ব
৩০ ধন্যা কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎকার পর্ব
৩১ পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব

জুন
৭ খ্রীষ্টের পুণ্য দেহ-রক্তের মহাপর্ব
৯ বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি-এর মৃত্যুবার্ষিকী
১১ প্রেরিতদূত সাধু বার্ণাবাস
১২ যীশু হৃদয়ের মহাপর্ব
১৩ পাদুয়ার সাধু আন্তনী, যাজক মহাচার্য
১৩ ধন্যা কুমারী মারীয়ার নির্মল হৃদয়, স্মরণদিবস
২১ বাবা দিবস
২৪ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মোৎসব মহাপর্ব
২৬ মহরম আশুরা
২৯ প্রেরিতশিষ্য সাধু পিতর ও পল মহাপর্ব

জুলাই
৩ প্রেরিতদূত সাধু টমাস-এর পর্ব
৪ পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ
৬ সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, কুমারী ও সাক্ষ্যমর
৯ সাধু আগষ্টিন ঝাও রং যাজক ও সঙ্গীগণ
১১ সাধু বেনেডিক্ট মঠাধ্যক্ষ
১৬ কার্মেল রাণী ধন্যা কুমারী মারীয়া
২২ সাধ্বী মেরী ম্যাগডালিন, পর্ব
২৫ প্রেরিতদূত সাধু যাকোব পব
২৯ সাধ্বী মার্থা, সাধ্বী মারীয়া ও সাধু লাজার

আগস্ট
৪ সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী
৫ মারীয়ার নামে নিবেদিত মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
৬ প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর পর্ব
১৬ ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২২ বিশ্বরাণী মারীয়া স্মরণ দিবস
২৭ সাধ্বী মনিকা স্মরণ দিবস
২৯ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের শিরচ্ছেদ, স্মরণদিবস

সেপ্টেম্বর
২ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ মাদার তেরেজা
৮ কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
২৮ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ মহাদূতগণ মিখায়েল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, পর্ব

অক্টোবর
২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৮ বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

নভেম্বর
১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ ধন্যা কুমারী মারীয়া নিবেদন পর্ব
২২ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

ডিসেম্বর
৮ কুমরী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায় দিবসসমূহ

মার্চ
১৯-২১ ঈদ-উল-ফিতর
২৬ স্বাধীনতা দিবস

এপ্রিল
১৪ বাংলা নববর্ষ

মে
১ বিশ্ব শ্রমিক দিবস
১০ মা দিবস
১৭ বিশ্ব যোগাযোগ দিবস
(২৫-২৭) ঈদ-উল আযহা
২৯ সম্প্রীতি দিবস

জুলাই
২৬ বিশ্ব দাদা-দাদী ও প্রবীণ দিবস

আগস্ট
৯ বিশ্ব আদিবাসী দিবস

সেপ্টেম্বর
৪ জন্মাষ্টমী

অক্টোবর
২১ দুর্গা পূজা

নভেম্বর
১৫ বিশ্ব দরিদ্র দিবস

ডিসেম্বর
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org